বঙ্গীয় রাজনীতিতে
মেরুকরণের জন্য
দায়ী তৃণমূল —পৃঃ ২৩

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

তৃণমূলের সঙ্গে মিমের
গোপন আঁতাত হতে পারে
— পৃঃ ২৭

৭৩ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১।। ২৫ মাঘ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

মেরুকরণের রাজনীতি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২৫ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৮ ফেব্রুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বিশেষ অঞ্চলেই কেন কৃষক আন্দোলন সীমাবদ্ধ, ভেবেছেন কী? ▯ বিশ্বামিত্র **▯ ৬**

সুন্দর মৌলিকের চিঠি : রাস্তা দিয়েই তো শিল্প আসবে ▯ ৬

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো নির্মাণে বাধা আঞ্চলিকতাবাদ ▯ স্বপন দাশগুপ্ত **▯ ৮**

এভাবেই ভারতে রামরাজ্য ফিরবে ▯ বিনোদ বনসল **▯ ৯**

ভারতীয় হয়েই বাঙ্গালিকে থাকতে হবে ▯ কল্যাণ চক্রবর্তী **▯ ১০**

পশ্চিমবঙ্গে হিংসার রাজনীতি বন্ধ করে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে হবে ▯ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী **▯ ১১**

বাঙ্গালির উঠোনে অক্ষয় হোক লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ▯ দীপ্তাস্য যশ **▯ ১৩**

কৃষিবিল নিয়ে কেন্দ্রের ভাবনায় যুক্তি আছে ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় **▯ ১৫**

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে ▯ রামানুজ গোস্বামী **▯ ১৭**

'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত কেন? ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা **▯ ১৮**

বঙ্গীয় রাজনীতিতে মেরুকরণের জন্য দায়ী তৃণমূল ▯ সুজিত রায় **▯ ২৩**

তৃণমূলের সঙ্গে মিমের গোপন আঁতাত হতে পারে ▯ সুকল্প চৌধুরী **▯ ২৭**

রটনা থেকে রটন্তী কালী : সমন্বয়ের রূপ ▯ নন্দলাল ভট্টচার্য **▯ ৩১**

একলিঙ্গ শিবের আশীর্বার্দধন্য বাপ্পারাওল ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার **▯ ৩২**

ওয়েসিকে পরোক্ষ উৎসাহ জোগাচ্ছেন মমতা ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস **▯ ৩৫**

বনবাসী গুরুমা কমলী সোরেন পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ▯ তরুণ কুমার পণ্ডিত **▯ ৩৭**

সাম্প্রতিক জাতীয় শিক্ষানীতি ও আমাদের শিশু ▯ ড. বিভাসকান্তি মণ্ডল **▯ ৩৮**

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষার প্রয়োজন ▯ ইন্দুমতী কাটদরে **▯ ৪৩**

তোলাবাজি উন্নয়নের কোন ধারায় পড়ে ভাবা দরকার ▯ অনামিক রায় **▯ ৪৫**

বাসন্তীদেবীর গ্রেপ্তার হবার খবরে কেঁদেছিলেন সুভাষ ▯ শুক্লা শিকদার **▯ ৪৭**

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২▯

শব্দরূপ : ৫০

প্রকাশিত হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কৃষি সংস্কার, কৃষক বিদ্রোহ এবং বাজেট ২০২১

কৃষিবিলের প্রতিবাদে দিল্লিতে কৃষকদের আন্দোলন চলছে। প্রথমে কয়েকদফা সংশোধনীর কথা বললেও এখন তাদের দাবি, কৃষিবিল প্রত্যাহার। এই আন্দোলনের অজুহাতে গত ২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকার অপমান করেছে তথাকথিত কৃষকরা। কী আছে কৃষি বিলে? দেশের সমস্ত কৃষক কি এই বিলের বিরোধিতা করছে, নাকি গুটিকয়েক কৃষক নামধারী ফড়ে ব্যবসায়ী কৃষক আন্দোলনের নামে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করছে? সারা দেশের কৃষকরা এই আন্দোলনের সঙ্গে কতটা যুক্ত। মোদী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিদেশী শক্তি পেছন থেকে কীভাবে উস্কে দিচ্ছে এই আন্দলেনকে। মোদী সরকারের বাজেটে কৃষকদের জন্য কী করা হয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় আলোচিত হবে এই বিষয়গুলি।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের আকাশে অশনিসংকেত

স্মরণাতীত কাল হইতে মহান সংস্কৃতি সম্পন্ন ভারতীয় জাতি এই ভারতভূমির সন্তান হিসাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহারা এই পবিত্র ভূমিকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়াছে। তাহারা নিজেদের এই মহান ভূমির পুত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। এই ভূমির হইতে পবিত্র ভারতবাসীর নিকট আর কিছুই হইতে পারে না। এই ভূমির প্রতিটি ধূলিকণা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বৃক্ষাদি, জড়-চেতন সবই তাহাদের নিকট পবিত্র। এই মহান ভারতভূমিতে সোনা ফলিত। তাহারই লোভে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা এই দেশ আক্রমণ করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে, মা-বোনেদের অপমান করিয়াছে, শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুগুলি ধ্বংস করিয়াছে। দীর্ঘ হাজার বৎসর তাহারা এই ভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। হাজার হাজার ভারত-সন্তান বুকের রক্তে পরধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দিনগুলিতে তৎকালীন কতিপয় রাজনৈতিক নেতা দেশের শত্রু-মিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারেন নাই। ভারতের সহিত সম্পর্করহিত খিলাফত আন্দোলকে সমর্থন করিয়া তাঁহারা সেইদিন তুষ্টিকরণের রাজনীতি শুরু করিয়াছিলেন। যাহার ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয়, ইতিহাস হইতে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। যে তোষণ ও তুষ্টিকরণের রাজনীতি ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়াছে, তাহার পরও তাহারা সেই মানসিকতা হইতে বিন্দুমাত্র বিরত হন নাই। যে কোনো প্রকারে ক্ষমতায় থাকিবার জন্য তোষণ ও তুষ্টিকরণের রাজনীতি তাহারা পূর্ণমাত্রায় বহাল রাখিয়াছেন। তোষণ নীতিরই পরিণতি স্বরূপ আমরা খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছি। যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিচক্ষণতায় বাঙ্গালি হিন্দুর অস্বিত্বরক্ষার ভূমিটুকু রক্ষা পাইয়াছে, তোষণকারী নেতারা সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামটিও স্মরণ করেন না। কমিউনিস্ট শাসনের চৌত্রিশ বৎসরের তোষণনীতি ওই বিশেষ সম্প্রদায়কে ভারতীয় হইতে বিরত রাখিয়াছে। তাহাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। বর্তমান শাসকদল তাহাদের 'দুধেল গোরু' হিসাবে দেখিয়াছে। তাহাদের লাথিতে রাজ্যের বহু স্থানে মিনি পাকিস্তান গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান শাসকদলের মন্ত্রী বিশেষ বিশেষ এলাকাকে মিনি পাকিস্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

বর্তমান রাজ্য সরকারের নগ্ন তোষণনীতির ফলে এই রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের ২৮ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটারকে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। সেই ভোটব্যাঙ্কের লোভে রাজ্যের রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছে হায়দরাবাদের পাকিস্তানপন্থী মিম। ইহাদের লক্ষ্য ভারতবর্ষকে ইসলামিস্তানে পরিণত করা। বর্তমান শাসকদলের তোষণনীতির ফলস্বরূপ এই মেরুকরণ পশ্চিমবঙ্গকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের আকাশে পুনরায় অশনিসংকেত শোনা যাইতেছে। বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মেরুকরণের ফলে দেশের বিভাজন-পূর্ব অবস্থার পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতেছেন। রামনামে তিনি অপমানিত বোধ করিতেছেন। সভায় সভায় তিনি 'লা ইলাহা মহম্মদ রসুলাল্লা' বলিতেছেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে। তাহাদের স্মরণ করিতে হইবে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাবধান বাণী —' একদিন মুসলমানরা লুণ্ঠন করিবার জন্যই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। সেইদিন তাহারা কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। বস্তুত অপর ধর্মে ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সম্পর্ক মানে নাই।' আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বাঙ্গালি হিন্দুর ইহা স্মরণ করিয়া সতর্ক হওয়া একান্ত কর্তব্য।

সুভাষিতম্

যস্য নৈসর্গিকী শোভা তন্ন সংস্কারমর্হতি।

কঃ কলাম্ শশিনো মার্ষ্টিকৌস্তুভঃ কেন রজ্যতে।।

যা প্রকৃতিগত ভাবে শোভমান তার সংস্কারে কোনো প্রয়োজন হয় না। চাঁদকে কে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে? কৌস্তুভমণিকে কোন জহুরি পালিশ করে?

বিশেষ অঞ্চলেই কেন কৃষক-আন্দোলন সীমাবদ্ধ, ভেবেছেন কি?

বিশ্বামিত্র

কেন্দ্রের আনা কৃষি-বিল নিয়ে আন্দোলন ঠিক কোন পথে চলেছিল তার অনেকটাই আভাস পাওয়া গেল গণতন্ত্র দিবসের দিন। চিরাচরিত ঐতিহ্যকে ধুলায় মিশিয়ে, স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্মানকে পদদলিত করে লালকেল্লায় উড়ল নিশান সাহিব। কোনও সন্দেহ নেই, গৈরিক নিশান সাহিব শিখ সম্প্রদায়ের কাছে অতি পবিত্র। কিন্তু স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের গণতন্ত্র দিবসের দিন ঐতিহাসিক সৌধে জাতীয় পতাকাই শোভা পায়। সেদিন সেখানে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের পতাকা ওড়ালে তা শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, জাতীয় সম্মানের পক্ষে অবমাননাকরও বটে। এটা বোঝার ক্ষমতা সেদিন যারা এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন, তাঁদের নেই ভাবলে খুব ভুল ভাবা হবে। বরং বেশি মাত্রায় আছে। তারা জেনেবুঝেই সেদিনের কর্মসূচিতে গিয়েছিল। ট্রাক্টর মিছিল থেকে ট্রাক্টর দিয়ে পুলিশদের হত্যার চেষ্টা হলো; তলোয়ার, লাঠি দিয়ে তাঁদের ওপর আক্রমণ চালানো হলো। পুলিশ পড়ে পড়ে মারও খেলো। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অল্প কিছুজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। নইলে শান্তিরক্ষার খাতিরে প্রাণ-সংশয়ের সম্ভাবনা নিয়েও পুলিশ অভূতপূর্ব সংযম দেখিয়েছে। আন্দোলন প্রথম থেকেই যে বিষয়টি ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে তা হলো সরকারের নমনীয় মনোভাব। কৃষিবিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব দৃঢ়। কিন্তু আলোচনার দরজা তারা বন্ধ করেনি। সাংবিধানিকতার খাতিরে ধরতে গেলে কেন্দ্র সরকার শুধু দায়বদ্ধ সংসদের উচ্চ ও নিম্নকক্ষের কাছে। সরকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দুই কক্ষেই রয়েছে, সেই মতো সেপ্টেম্বর মাসে উভয়কক্ষে কৃষিবিল পাশও হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি বিলে সইও করে দেন ২৭ সেপ্টেম্বর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনেই সমগ্র প্রক্রিয়াটা এগিয়েছে। তারপরেও যখন একটি বিশেষ অঞ্চলে বিলের প্রতিবাদে আন্দোলন দেখা দিল এবং রাজধানী অবরুদ্ধ করার ডাক ইত্যাদি দেওয়া হলো, কেন্দ্রের কোনও দায় ছিল না 'কৃষক'দের সঙ্গে আলোচনায় বসার। তবুও গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারকে মর্যাদা দিয়ে সরকার তাদের বারংবার আলোচনায় সময় দিল। কিন্তু দেখা গেল, আলোচনায় বসতে 'কৃষক'দের ঘোর অনীহা। যেন তারা যেন-তেন-প্রকারেণ আলোচনা ভেস্তে দিয়ে 'আন্দোলনে' যেতে পারলেই বাঁচে! এই প্রবণতা আমরা আগেও দেখেছি। রাজনীতিতে উপরে ওঠার অন্যতম যোগ্যতা আন্দোলনের ইস্যু তৈরি করা ও নিরন্তর আন্দোলনে থাকা। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠবেই, কৃষকরা আদৌ কী চান? সুষ্ঠ মীমাংসা নাকি আন্দোলন? ভারতবাসীর কাছে বিষয়টি হয়তো তত পরিষ্কার হবে না, যতটা হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে। বিশেষ করে যারা একসময় কলকারখানায় চাকরি করতেন। একসময়ে রীতিমতো চালু, লাভজনক, বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানাগুলো সিপিএমের আমলে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল তাদের শ্রমিক সংগঠন সিটুর অন্যায্য, নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির আন্দোলনের চাপে। বাঙ্গালির প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টির এই হঠকারী রাজনীতির ফলে। আজ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নেই বলে যে আক্ষেপ করা হয়, তার জনক তৃণমূল নয়, বরং কমিউনিস্ট পার্টি। তৃণমূল বড়োজোর সেই কমিউনিস্ট নীতিকেই অনুসরণ করেছে মাত্র।

এবার খেয়াল করে দেখুন, এই আন্দোলনের পেছনে কারা আছে! এর নেতৃত্বে আছে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সংগঠন সর্বভারতীয় কৃষক সভা। যার সভাপতি পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হান্নান মোল্লা। সারা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির জনভিত্তি তলানিতে। গত লোকসভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির এক শতাংশ ভোট জুটেছিল। তবে সংসদ যে শুয়োরের খোয়ার প্রায় প্রবাদ হয়ে যাওয়া এই নীতি-বাক্যে তাঁরা রীতিমতো আস্থা রেখেছেন এখনও, দেখেও চমৎকৃত হই। তাই ভোটের বাজার যতই খারাপ হোক না কেন, লোক খেপানোয় তাদের জুড়ি মেলা ভার। আপনাদের মনে থাকতে পারে, ২০১৮-য় মহারাষ্ট্রেও 'কৃষক' মহামিছিল হয়েছিল। সেই মহামিছিলের খবর যারা রাখতেন, তারা বিস্মিত হয়েছিলেন ভোটের বাক্সে তার প্রভাব না পড়ার জন্য। ইভিএম-হ্যাকের গল্পটা বাজারে কিছুকাল চলেছিল, তারপর বিরোধীরা কিছু নির্বাচনী সাফল্য পাওয়াও সেটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে। ইদানীং নতুন বোতলে পুরনো মদ চালানোর চেষ্টা করছেন ব্যক্তিগত জীবনে আদ্যন্ত কমিউনিস্ট, প্রাক্তন আইএএসের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি।

যাইহোক, আসল কারণটা এবার বোধহয় বোঝা যাচ্ছে। এই 'কৃষক'রা বোধহয় কেউ কৃষিজীবী নন। যেমন সিঙ্গুর হয়ে জঙ্গি আন্দোলন চালিয়ে কলকারখানা যারা বন্ধ করতেন, তারা কেউই শ্রমজীবী ছিলেন না। নইলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়েছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার খেসারত দিয়েছে অথচ শ্রমিক নেতারা বহাল তবিয়তে রইলেন, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, বাড়ি-গাড়ি করলেন, তা কী করে সম্ভব? এখনকার কৃষক আন্দোলনটাও ঠিক সেই রকম। সাধারণ কৃষকের এই আন্দোলনের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ থাকলে আন্দোলন সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়তো, কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকতো না। বিশেষত সেই অঞ্চলে যেখানে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার নজর রয়েছে, ভারতের রাজধানী হওয়ার কারণে। সারা ভারতে যখন কৃষক অসন্তোষের কোনও খবর নেই, বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যখন নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গে কৃষক-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করছেন, কৃষকদের সংশয় থাকতেই পারে কিন্তু পুরো বিষয়টি বোঝানোর পর তাঁরা অন্তত বুঝতে চাইছেন। তখন ভারতের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের কৃষকরাই কেন 'অসন্তুষ্ট'? শত বোঝালেও কেন নাছোড়? কৃষক আইন তো সারা দেশের জন্যই লাগু হয়েছে। তাহলে আন্দোলনের কেন এই বৈষম্য? ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিশ করুন। ▯

রাস্তা দিয়েই তো শিল্প আসবে

মাননীয় নির্মলা সীতারমণ
অর্থমন্ত্রী, ভারত সরকার

আপনাকে একজন বাঙ্গালি হিসেবে ধন্যবাদ। পশ্চিমবঙ্গের জন্য আপনি নতুন পথের কথা বলেছেন বাজেটে। খুব দরকার। ওই পথ দিয়েই তো আসবে শিল্প, আসবে কর্মসংস্থান।

কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের ঝুলিতে কী আসে, তা জানার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। আপনি খুশি করেছেন আমায়। খুশি হয়েছে রাজ্যবাসী। বাজেট পেশের সময় আপনার পরনের লালপেড়ে শাড়ি দেখেই মনে হচ্ছিল আপনি বাঙ্গালির কষ্টটা বুঝবেন। উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। পশ্চিমবঙ্গের বিকাশ আর সেখানকার মানুষের সুবিধার জন্য বাজেটের মাধ্যমে ২৫ হাজার কোটি টাকার অনুদান ঘোষণা করেছেন। যার মাধ্যমে ৬৭৫ কিলোমিটার রাজপথের নির্মাণ হবে। এরই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের চা বাগানে কর্মরত মানুষের কল্যাণের জন্যও হাজার কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে।

বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের সড়ক ও রেল প্রকল্পের পরিকাঠামোগত উন্নতিতে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পেয়েছে ৬৭৫ কিলোমিটার সড়ক। বরাদ্দ হয়েছে ৬৭৫ কোটি টাকা। উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা সংযোগকারী কলকাতা-শিলিগুড়ি সড়কের আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে রেলের দু'টি নতুন পণ্যবাহী করিডরের মাধ্যমে রাজ্যকে জোড়ার কথা ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে ইস্ট কোস্ট করিডরের মাধ্যমে খড়্গপুরের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিজয়ওয়াড়া, অন্য দিকে ইস্ট-ওয়েস্ট সাব করিডরের মাধ্যমে এক দিকে পশ্চিম ভারতের ভুসাবল থেকে খড়্গপুর হয়ে ডানকুনি। ওই করিডরের দ্বিতীয় অংশে— রাজখরসাওয়াঁ থেকে অন্ডালে যোগাযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। সড়কের উন্নয়নের সঙ্গেই দেশে সরকারি গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গকে যে 'সোনার বাঙ্গলা' উপহার দেওয়ার কথা বিজেপি বলছে সত্যিই এই ঘোষণাগুলো দরকার ছিল। আসলে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি দরকার শিল্প। বামেরা তা বন্ধ করে দিয়েছিল আর দিদিমণির তৃণমূল শেষ করে দিয়েছে। এখন নতুন করে রাজ্যে বিনিয়োগ আনার জন্য চাই পরিকাঠামো। সেই কাজটাই তো আপনি করতে চেয়েছেন। ধন্যবাদ দিদি।

না, আপনাকে দিদি বলেছি বলে নিজের দিদিকে ভুলতে পারব না। তিনিও কম করেননি। এই তো কদিন আগে ভোট এসে গেছে বুঝতে পেরে তিনি 'পথশ্রী' নামে অভিযান শুরু করেছেন। তাতে অবশ্য রাস্তা তৈরি হবে না। রাস্তা মেরামত হবে। অন্তত বিধানসভা ভোটের আগে যাতে ভোটারদের হোচট খেতে না হয় তার জন্যই আমার দিদি ভেবেছেন।

গত ১ অক্টোবর তিনি 'পথশ্রী' অভিযান নামে প্রকল্পে রাজ্যে মোট ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা মেরামত হবে বলে ঘোষণা করেন। এর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ৭ হাজার রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে বলে টুইটারেও লেখেন তিনি। ওই দিনই নবান্নের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাম আমল ও তৃণমূল জমানায় রাজ্যে সড়ক নির্মাণ কতটা গুরুত্ব পেয়েছে তার একটি তুলনামূলক হিসেব প্রকাশ করা হয়। সেই হিসেব অনুযায়ী, বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যে ৯২ হাজার ২৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছিল। আর পশ্চিমবঙ্গে এখন (১ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত) রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৩০ কিলোমিটার। রাস্তা হলেও তা যে চলার উপযুক্ত নয় সেটায় কিন্তু দিদির দোষ দেখলে হবে না। দুষ্টু ভাইয়েরা যদি কাটমানি খায় তাহলে দিদি কী করবেন?

যাইহোক, বাঙ্গলার জন্য রাস্তা বানানোর প্রকল্প জানানোয় আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেই টাকা কি সরাসরি কেন্দ্র খরচ করবে নাকি আবার দিদির মাধ্যমে? তবে দিদি আর মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে থাকতে পারবেন কিনা সেটা নিয়ে আমি একটু চিন্তাতেই আছি। □

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো নির্মাণে বাধা আঞ্চলিকতাবাদ

স্বপ্ন দাশগুপ্ত

নয় বছর আগে অসমের কোকরাঝাড় জেলায় বোড়ো এবং মুসলমানদের মধ্যে এক বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। এর ফলে প্রায় ৮০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং প্রায় চার লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পশ্চিমি মিডিয়া চোখের জল ফেলে বলেছিল যে, এটি একটি 'মানবিক বিপর্যয়'।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই দাঙ্গা ভারতের ন্যাশানাল মিডিয়াকে প্রভাবিত করতে পারেনি। সাংবাদিক বন্ধুরা দূরবর্তী অসমে ছুটে যাননি। পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিকরা ওই দাঙ্গাপীড়িত মানুষদের আতঙ্ককে সেরকমভাবে কোনো গণমাধ্যমে তুলে ধরেননি। কোকরাঝাড়ের দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায় দেশের মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল কিছু খবরের কাগজে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবার ভেতরের পাতায় ছোটো করে) নিষ্প্রাণভাবে। সাংবাদিকরা একটি ছোটো স্তম্ভ লিখেই তাঁদের দায় সেরেছিলেন। মিডিয়ার এই ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে একজন সিনিয়র সাংবাদিক, যিনি সমাজের কোনো ত্রুটি দেখলেই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিষয়টিকে 'দূরত্বের স্বৈরাচার' বলে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ কোকরাঝাড় প্রত্যন্ত অঞ্চল বলেই সম্ভবত বিষয়টি এতটা প্রচার মাধ্যমের আলোয় আসেনি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ওই 'মানবিক বিপর্যয়'-এর সঙ্গে তুলনা করলে দিল্লি উপকণ্ঠের কৃষকবিদ্রোহ অনেক বেশি গণমাধ্যমের আলোয় আলোকিত হয়েছে। সরকারের সঙ্গে কৃষকসংগঠনগুলির অতি দীর্ঘায়িত আলোচনা, সুপ্রিমকোর্টে শুনানি, আন্দোলনকারীদের দীর্ঘ অপেক্ষা ও আন্দোলন— সবকিছুই সুনিপুণভাবে এবং দীর্ঘায়িতভাবে গণমাধ্যমে স্থান পেয়েছে।

কৃষিজাত পণ্যের বিপণনে যে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে— সেই ব্যাপারে পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। এই বিক্ষোভ অনেকটাই প্রচারের আলো পেয়েছে, যাইহোক, কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রতিবাদকারীরা যদি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের আলুচাষি বা মেঘালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লঙ্কাচাষি হতো— তাহলেও কী তারা গণতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনকে হুমকি দেওয়ার মতো একই ভাবে প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হতো? আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এই আন্দোলন যদি দিল্লি থেকে অনেক দূরে কোনো স্থানে হতো, তাহলে কি সুপ্রিম কোর্ট এই সক্রিয়তা দেখাতে পারত? 'দূরত্বের স্বৈরাচার'-এর কারণে কোকরাঝাড় যদি ব্রাত্য হয়, পঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষকরা কি দিল্লি থেকে কম দূরত্বের কারণে সুবিধা পেল না?

প্রশ্নটি শিক্ষাসংক্রান্ত নয়। ২-১ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করে যে, কলেজের গেস্ট লেকচারারদের (যাদের নিয়োগকরা হয়েছিল নির্ধারিত মানদণ্ডকে না মেনেই) কলেজের স্থায়ী অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হবে। এর প্রতিবাদে একঝাঁক তরুণ রিসার্চ স্কলার আন্দোলন করে। তাঁরা যথাযথভাবেই অনুভব করেন যে, রাজ্যসরকার শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের ভবিষ্যতের সুযোগ- সুবিধাকে অনেকটা সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে।

তারা তাদের এই উপলব্ধির কথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে জানায়, যারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থের জোগান দেয় এবং শিক্ষার গুণগতমান রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি দেখে। পুরো এক বছর ধরে তারা ইউজিসি-কে চিঠি লেখে, কলকাতায় ইউজিসি-র আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিনিধি পাঠায় এবং সংসদে তাদের বিরোধিতার বিষয়কে তুলে ধরতে সফল হয়। দুর্ভাগ্যবশত তারা কোনো উত্তর পায়নি। দিল্লির ইউজিসি কার্যালয় উত্তর দেওয়ার মতো সৌজন্য দেখায়নি। এই তরুণ রিসার্চ স্কলাররা তাঁদের আন্দোলনে অটল। সর্বশেষ জানা খবর, ইউজিসি-র আঞ্চলিক কার্যালয় তাদের দিল্লিতে গিয়ে বিষয়টি জানাতে বলেছে।

বিষয়টিকে গৌণ বলে মনে হতে পারে। এই ছোটো গ্রুপটির পক্ষে তাদের আন্দোলনকে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি এবং তারা ন্যাশনাল মিডিয়ার কভারেজ পেতেও সক্ষম হয়নি। এ বিষয়টি সম্ভবত আমলাতন্ত্রের উদাসীনতাকেই প্রকট করল। কিন্তু এই চিত্রটি বদলে যেত যদি অনুরূপ একটি আইন দিল্লির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য হতো। পুরো সিস্টেমকে নাড়া দেওয়া, তাদের কথা শোনার মতো পরিবেশ তৈরি করা এবং সম্ভবত তাদের সমস্যা সমাধানের পথকে মসৃণ করার ক্ষমতা তাদের আছে— শুধুমাত্র একটাই কারণে যে, তারা দিল্লিতে অবস্থিত।

রাজনীতির নীতিতে আঞ্চলিকতাবাদকে নিন্দা করা হয় এবং 'একভারত শ্রেষ্ঠভারত'—এই নীতিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। 'একভারত'-এর নীতি অনুযায়ী দক্ষিণ দিল্লি এবং দক্ষিণ মেদিনীপুরের বাসিন্দারা একই সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে— এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে 'দিল্লি থেকে দূরত্বের অভিশাপ' একটি সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ন্যায়সঙ্গত 'ফেডেরালিজম্' শুধুমাত্র সংবিধান থেকে আসে না। এটি তৈরি হয় সকলের সমান কণ্ঠস্বরকে মান্যতা দিয়ে, সকলের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে— যেখানে দূরত্ব কোনো বাধা হবে না।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাংসদ)

এভাবেই ভারতে রামরাজ্য ফিরবে

বিনোদ বনসল

ভারতে ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পুণ্য দিনে লালকেল্লার প্রাচীর থেকে ব্রিটিশদের ইউনিয়ন জ্যাককে নামিয়ে আমাদের তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ ওইদিন আমাদের দেশ ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়। ২৬ জানুয়ারি এমন একখানা দিন যখন আমরা আমাদের ইংরেজদের চাপিয়ে দেওয়া আইন থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। আমরা সেই দিনে নিজস্ব স্বাধীন সংবিধানের অঙ্গীকার করি। বাবাসাহেব আম্বেদকর ও তৎকালীন সংবিধান সভার অন্যান্য সদস্যেরা বিভিন্ন দেশের সংবিধানের দীর্ঘ অধ্যয়ন করে প্রায় দেড় বছর পরিশ্রম করে ভারতের সংবিধান রচনা করেন। ভারতীয়দের পরিস্থিতি অনুসারে উচিত, অনুচিত, করণীয় ও অকরণীয় কার্য, প্রাথমিক অধিকার, অন্যান্য অধিকার এবং রাজ্যগুলির নীতি নির্দেশক তত্ত্ব নিয়ে ভারতের সংবিধানের রচনা হয়।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন আসে গণতন্ত্র কী? সাধারণভাবে জনগণ দ্বারা জনগণের জন্য যে নীতিকে বিকশিত করা হয় তাকেই গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্রের তিনটি প্রাথমিক বিভাগ। ন্যায় পালিকা, কার্যপালিকা ও বিধায়িকা। এই তিনটি বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করার অধিকার সংবিধানে দেওয়া আছে। যেমন মানুষকে ন্যায় প্রদান করার জন্য উপযুক্ত ন্যায় ব্যবস্থা প্রয়োজন সেভাবেই বিধায়িকা ব্যবস্থা দ্বারা সঠিক ন্যায় নিরূপণ করাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। ন্যায়ালয় দ্বারা প্রদত্ত আদেশ ও বিধায়িকা ব্যবস্থা দ্বারা বিভিন্ন নির্দেশের সঠিক পালন ও বিধিভঙ্গ করলে তদনুরূপ শাস্তি প্রদান করা কার্যপালিকা বিভাগের।

লোকতন্ত্রের এই তিন স্তম্ভ যাদের জন্য বানানো সেই জনতারও এর প্রতি একটা কর্তব্য থাকে। তখনই গণতন্ত্র সার্থক হয়। জনতার তার নিজস্ব পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির প্রতি সক্রিয় থাকা দরকার। রাষ্ট্রকে দৃঢ় করার প্রতিটি ব্যবস্থা, পরম্পরা ও মান্যতাকে পালন করা উচিত। পরিশ্রম, কর্মনিষ্ঠা তথা রাষ্ট্রপ্রেমে কখনও কোনো কমতি যেন না আসে। এই উদ্দেশ্যে একজন সজাগ প্রহরীর মতো কাজ করে যেতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান ও তার নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তথা মান্যতাকে সুষ্ঠ ও সুদৃঢ় রাখার জন্য সদা তৎপর থাকতে হবে।

সমান নাগরিক অধিকার, গোরক্ষা, সমান ন্যায় ও নিঃশুল্ক আইনি পরিষেবা, প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ ও শিক্ষার মতো অনেক নির্দেশই সংবিধানে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সব নির্দেশের স্বার্থক স্বরূপ এখনো প্রতীক্ষিত। এর অভাবেই দেশে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, ও দেশবিরোধী গতিবিধি বাড়ছে। কিছু দল তাদের ভোট পাওয়ার লোভে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের তুষ্ট করার চেষ্টা করছে। যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে বর্তমান সরকার দ্রুত গতিতে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান পুনরুদ্ধারে কাজ করে চলেছে। তিনতালাক ও ৩৭০ ধারার রদ, বহু যুদ্ধের পর রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ, নাগরিক সংশোধন আইনের সৃষ্টি ইত্যাদি অনেক চিরপ্রতিক্ষিত কিন্তু অসম্ভব মনে হওয়া কাজগুলিকে বর্তমান কেন্দ্র সরকার খুবই মননশীল ভাবে করেছেন। তথাপি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি করা দরকার।

১. মনুস্মৃতি ও ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত ন্যায়ের শাশ্বত সিদ্ধান্তের পালন স্বয়ং করা ও লোকতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে পালন করানো।

২. সরকার ও শিক্ষা সংস্থানগুলির দ্বারা বৈদিক ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের বিকাশের জন্য বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমে বানানো হোক। একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই নীতি কোনো বিশেষ মত-পথ-সম্প্রদায়ের না হয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য হয়।

৩. সীমান্তে উপস্থিত সেনার প্রাথমিক প্রশিক্ষণের একটা ভাগ যেন সব নাগরিককেই দেওয়া যায়। এর থেকে রাষ্ট্রীয়তা ও সেনাদের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

৪. রাষ্ট্র ও তার আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশই হলো সর্বোপরি। এই শিক্ষা যেন বাল্যকাল থেকে দেওয়া হয়।

৫. প্রত্যেক দেশবাসীকে তার নাগরিক অধিকারগুলির সঙ্গে ভালো ভাবে পরিচয় করানো হোক।

৬. মতদান প্রক্রিয়াকে এতটাই সরল ও পারদর্শী বানানো হোক যার ফলে একশো শতাংশ মতদান সুনিশ্চিত করা যায়, যেমন—অন লাইন ভোটিং।

৭. ভোট দেওয়াকে শুধুমাত্র অধিকার না ভেবে নিজের কর্তব্য ভেবে সঠিক প্রার্থীদের ভোট দিতে হবে।

৮. স্বেচ্ছায় ভোট না দেওয়া ব্যক্তিদের প্রতি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক যাতে মতদাতাদের মধ্যে উদাসীনতার কারণে সংসদ ও বিধানসভাগুলিতে অনুচিত ব্যক্তি না যেতে পারে।

৯. জনপ্রতিনিধিদের আয়ু, শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি সুনিশ্চিত হোক।

১০. জনপ্রতিনিধিদের কাজের বার্ষিক মূল্যায়ণ অর্থিক ও সামাজিক দানের আধারে অবশ্যই করা হোক। তার সঙ্গেই সেই মূল্যায়নকে সার্বজনীন করা হোক।

১১. ভৌতিক ও আর্থিক বিকাশের সঙ্গে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় মূল্যের ও সমান বিকাশ বার্ষিক হিসাব হোক।

১২. জাতি, মত, পন্থ-সম্প্রদায়, ভাষা ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করার রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হোক।

যদি উপরোক্ত কথাগুলিতে গভীরভাবে বিচার করা যায় তবে সেইদিন আর দূর নেই যখন ভারতে আবার রামরাজ্য ফিরে আসবে, ভারত আবারও বিশ্বগুরু রূপে পূজিত হবে।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা)

ভারতীয় হয়েই বাঙ্গালিকে থাকতে হবে

কল্যাণ চক্রবর্তী

'জায় বাংলা' একটি পাকা মাথার স্লোগান, ধার করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে। একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলেছে মুজিবুর রহমানকে সর্বকালের সেরা বাঙ্গালি দেখানোর জন্য। কেন? তার অনুসন্ধান জরুরি। মুজিবুর সম্পর্কে যারা খোঁজ খবর রাখেন, তারা বলতে পারবেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বাংলায় প্রদত্ত অভিভাষণের সময় তিনি কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন।

এই মুহূর্তে 'জয় বাংলা'-র কথা ব্যস্ত-সাব্যস্ত হয়ে বলা মানেই 'সুবে বাংলা'-র পৃষ্ঠপোষকতা করা, মনে করছেন তথ্যভিজ্ঞ মহল। 'সুবে বাংলা' কী; তার সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য কী তা অনুভবের বিষয়, সেটাও তথ্যভিজ্ঞ মহলেরই মতামত।

আমি বলবো, 'মহাভারতের বঙ্গ/অমৃতসমান'/ অর্থাৎ 'ভারত' বা সমগ্র ভারত বা মহাভারত বাদ দিয়ে 'বঙ্গ' হতেই পারে না, হওয়া সম্ভবও নয়, 'বাংলা' তো নয়ই। রূপে-তাৎপর্যে 'বঙ্গ' আর 'বাংলা' এক ও অভিন্ন নয়। একটি কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস, অপরটি কয়েকশো বছর আগের কথা।

ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে সুবে বাংলাই ভবিতব্য হতো। বাঙ্গালিকে সমগ্র ভারতীয় জাতির সঙ্গে সমন্বিত ভাবে তাই থাকতে হবে।

নিকট অতীতে অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালি তা পারেনি। ভারতীয় হয়ে বাঙ্গালির থাকা উচিত ছিল। তার জন্য কি সিপিএম, কংগ্রেস নিজেরাই দায়ী নয়? দলের প্রসঙ্গ টানলাম এই জন্যে, জয় বাংলার রাজনীতিবেত্তারা বলছে, গুটকাখোর বিজেপি এ রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধী। তারা বলে, বাঙ্গালিত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায় না বিজেপি। কিন্তু বলুন দেখি—

১. জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী না করার প্ল্যান কি বিজেপির? প্রণব মুখার্জির প্রধানমন্ত্রিত্ব ঠেকিয়েছিল কি বিজেপি?

২. মিছিমিছি কেন্দ্র বিরোধিতা করে, রাজ্যের প্রগতি বন্ধ করার দীর্ঘ বাম জমানা কি ছিল না?

৩. তৃণমূল শাসনে একই বিরোধিতার রাস্তায় হাঁটেনি কি রাজ্যের শাসকদল?

এইসব করে কি রাজ্যের উন্নতি হয়েছে? বাঙ্গলার নাম করে কেন্দ্রের বিরোধিতা করা একটি বহু পুরাতন ও ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতি। যে মানুষটি এটি বুঝতে ব্যর্থ, তার স্কুলে যাওয়াই বৃথা! শাসনপাট দখলে রাখার জন্য কেন্দ্রের বিরোধিতা করা রাজ্যের রাজনীতিবেত্তাদের স্বভাব। ওদের স্বাভাবগত ইতিহাস ভুলিয়ে আবার নতুন করে রাষ্ট্রবাদী শাসকদলের বিরুদ্ধে যেতে হবে, তাই এইসব প্রোপাগান্ডার আয়োজন রয়েছে।

পাশের রাজ্যগুলি কিন্তু বাস্তবতা বুঝে নিজের নিজের রাজ্যের উন্নতি করে নিয়েছে। আমরা কেন্দ্র-রাজ্য করেছি। আর আঙুল চুষছি। এখন বাংলা -হিন্দির রাজনীতি করছি। নিজেরা অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছি। আর নিউইয়র্ক/লন্ডনে পালিয়ে যাচ্ছি।

নিরক্ষর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন কাকে এ রাজ্যে এবার আনতে হবে। ওরাই সভ্যতার পিলসুজ। বাঙ্গালি হিন্দু যেন আত্মহননের পথে এখন না যান। শৃঙ্খলা, বাঙ্গালির শৃঙ্খলার বড্ড অভাব। কথায় বলে 'তিনটি বাঙ্গালি দুটি কালীপুজো।' উচ্ছৃঙ্খল বলেই ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঙ্গালি রাজনৈতিক কর্মীরা তার অন্য দলের ভাইদের ধরে ধরে হত্যা করেছিল। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে নির্বাচনে এত সহিংসতার ঘটনা ঘটে না। এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলি কারা করছে?

বাঙ্গালি হিন্দুর ভোট বড়ো বালাই, তাই যাদবপুরের স্বামীজীর মূর্তি বিরোধী বামপন্থী সংগঠনগুলি আজ 'স্বামীজী' 'স্বামীজী' করছে। এটা কী তাদের অন্তরের কথা! শ্রীচৈতন্যদেব, স্বামীজী যদি এতই বড়ো প্রেরণা, তো একটি কমিউনিস্ট দল হলো না কেন, যার নাম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (চৈতন্যবাদী/অথবা বিবেকানন্দবাদী)? ওরাই তো বিশ্বের সবাচাইতে বড়ো কমিউনিস্ট ছিলেন!

বাঙ্গালি বহু মনীষার অবস্থান থাকা সত্ত্বেও কেন পার্টি অফিসগুলিতে ঝোলে মার্কস, লেনিন, স্তালিন, হো চি মিন, গুয়েভারার ছবি? দেশের নেতৃত্ব দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আগে হিন্দু বাঙ্গালির আবেগ পূরণ করতে হবে। হাজার হাজার বছরের বাঙ্গালির সংস্কৃতি/উৎসব/মেলা/আচার/পোশাক/খাদ্য/ধর্ম বাদ দিয়ে কেবল বাংলায় কথা বললে বাঙ্গালি হওয়া যায় না।

এরা চাইছে বাঙ্গালি দুইদিক থেকেই কোণঠাসা হোক। গোটা ভারত থেকে বাঙ্গালি বাঙ্গালি করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, আর 'সুবে বাংলা' গঠনের পথ পরিষ্কার করে হিন্দু বাঙ্গালির সভ্যতা-সংস্কৃতিগুলি বিনষ্ট করায় সংবাদে নিশ্চুপ থেকে। এদের ভণ্ডামি বন্ধ হোক। এদের প্রয়াস সার্থক হলে, সত্যিই একসময় এমন ব্যাপার হবে, যখন এখানকার লোক বাংলায় কথা বললেও, চিরায়ত বাঙ্গালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হবেন না। □

পশ্চিমবঙ্গে হিংসার রাজনীতি বন্ধ করে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে হবে

একদিনে সমস্ত জঞ্জাল সাফ হবে না। কিন্তু শুরুটা তো হতে পারত। জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারত আগের প্রায় পঞ্চাশ বছরের থেকে পৃথক একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সরকার এসেছে। মানুষের মনে এই ভাবনা না জাগাতে পারলে যত আত্মবিশ্বাসী রাজনৈতিক দল হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হিংসা বন্ধ করে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারবে না।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

এই প্রতিবেদন লেখার সময় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গে দুদিনের বৈঠক শেষে ফিরে গিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনও রাজ্যপাল মহোদয়ের মতো আপামর রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন যে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ হবে। এই কথার গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গে বাম জমানার শুরু থেকে, ১৯৬৭-র নির্বাচন ও তার পরবর্তী সব সাধারণ নির্বাচন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের হিংসা ও প্রাণহানির ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহু হাজার মানুষের বাড়ি ঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা এবং প্রায় হাজারখানেক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এর একটা নির্দিষ্ট গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম খাদ্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সরকারের দমন পীড়ন নীতির সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনকারীদের সরকারি সম্পত্তি নষ্টের মধ্যে দিয়ে একটি প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির জন্ম হলো। তার পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস ও বামপন্থী নেতৃত্বের সুযোগসন্ধানী নীতির প্রয়োগে কিছু মেধাবী কিন্তু রোমান্টিক মননের ছাত্র-ছাত্রী আল্ট্রা-কমিউনিজমের শিকার হলো এবং বাস্তববুদ্ধিরহিত ছাত্র তথাকথিত মাওবাদী রাজনীতির জন্ম হলো। এই রাজনীতিকে দমন করতে প্রথমে কংগ্রেস ও পরে বামপন্থীরা মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ করল।

বিপথগামী যুবকদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা না করে, তাদের আন্দোলনের দুই মূল লক্ষ্য— কৃষিতে শোষণ ও শিক্ষায় দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা না করে আন্দোলনকে বলপূর্বক স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হলো। এদের মধ্যে সমাজবিরোধীদের মিশিয়ে দিয়ে, নির্মমভাবে এই আন্দোলন দমন করা হলো। তখন মানুষ খুনে দলদাস পুলিশকে লাগানো হলো। এর ফলশ্রুতি হলো, পুলিশ মানুষ খুনের লাইসেন্স (!) পেল আর লাইসেন্সধারী গুন্ডায় পরিণত হলো। ফলত, পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা দূরত্ব তৈরি হলো। আরেকটি সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া আমরা দেখলাম। শাসকের মনে এই ধারণা জন্মালো যে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে, জনগণের অধিকার ও নায্য সুযোগ সুবিধা না দিলেও যে কোনো প্রতিবাদ, প্রতিরোধ স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। আর এই ধারণার ফলে, রাজনীতিতে স্বৈরাচারী মনোভাব, বিশেষত সরকারি দলের মধ্যে সুপ্রোথিত হলো। প্রথমদিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে স্বৈরাচার এগিয়ে চললেও একটা সময় এলো যখন মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার উপক্রম হলো। তখন পশ্চিমবঙ্গবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে একটা অলিখিত সমঝোতা হলো, যার ফলে সাধারণ মানুষের নিগ্রহের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যুগপৎ জনস্বার্থবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলায় রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিবাদের রাজনৈতিক ভাষাও আর থাকলো না। এইভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাজ্যে কুস্তি, কেন্দ্রে দোস্তি' আচরণে সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল।

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এই বীতরাগের খবর পৌঁছালো। তখন ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যের পুলিশ, যারা ইতিমধ্যে দলদাসে পরিণত হয়েছে, তাদের সাহায্যে ও দলের সমাজবিরোধীদের মদতে ভোটের সময় অসন্তুষ্ট ভোটারদের 'সমঝানো'র কাজ শুরু করে দিল। রাজ্য সরকারের উপর জনগণের অসন্তোষ যত বৃদ্ধি পেল, ততই এই দমন নীতি গতি পেতে লাগল। ভোট জালিয়াতি ও ভোটে হিংসার কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা বলা দরকার তা হলো, রাজনীতির দুবৃত্তায়ন। এই জিনিসটি একটু বিশদে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভারতের অন্য রাজ্যগুলির থেকে বেশ খানিকটা আলাদা।

পূর্বপাকিস্তানে গণহত্যা, ধর্ষণ ও নানাবিধ অত্যাচারে সর্বস্ব খুঁইয়ে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা কংগ্রেস সরকারের কাছে বিশেষ কোনো পুনর্বাসন প্রকল্প পাননি। পঞ্জাবের শরণার্থীদের অবস্থা কিন্তু এতটা খারাপ ছিল না। এরপর ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আবার একটা বড়ো সংখ্যায় পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের একবস্ত্রে বিতাড়িত করা হলে তারাও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। তখন কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করছে। তারা শিয়ালদা স্টেশন ও অন্য কয়েকটি জায়গায় শরণার্থীদের দুধ, খাবার বিতরণ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠন

ফঃ ২

বাড়াতে লাগল। এদিকে এত বাঙ্গালি শরণার্থীর চাপে পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের সংস্থানে চাপ পড়ল। ফল, 'ঘটি' 'বাঙ্গাল' সমস্যার জন্ম হলো। কংগ্রেস মূলত ঘটি নেতাদের দল হওয়ায় তারা রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে এইসব হতভাগ্য শরণাথীদের অবহেলার চোখে দেখতে লাগল। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এই শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য চাপ সৃষ্টিও করল না। এদিকে কমিউনিস্টরা, বিশেষত সিপিএম এই সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করে শরণার্থীদের মধ্যে নিজেদের দলের সংগঠন বিস্তারে মনোযোগী হলো।

এই কাজে শরণার্থী না হয়েও কিছু নেতার পূর্ববঙ্গীয় শিকড়কে তারা ব্যবহার করল। যেমন জ্যোতি বসু ও সুভাষ চক্রবর্তী। কিছু লোভী শরণার্থীকে তারা পার্টির বিস্তারে ব্যবহার করে স্থানীয় নেতৃত্বে উন্নীত করল। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ভোটের ফলে বুঝল যে বড়ো ভুল হয়েছে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় শক্তিশালী সংগঠন বানিয়েছে যার অন্যতম শক্ত খুঁটি হিন্দু বাঙ্গালি শরণার্থীরা। পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায় পুরোপুরি সিপিএমের সঙ্গে চলে গেল। এরপর কংগ্রেসের কাছে সুযোগ এলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়। ভারত সরকারের অকৃপণ সাহায্য ও শেষমেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ ও ১৯৭১-এর খানসেনা ও রাজাকার বাহিনীর যৌথ অত্যাচারের কেন্দ্রে ছিল সে দেশের বাঙ্গালি হিন্দুরা। এর অবিসংবাদিত ফল, ১৯৭০-৭১-এ তৃতীয় পর্যায়ের হিন্দু শরণার্থী আগমন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার শুরু করলেও জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার এইসব শরণাথীদের ভোটাধিকারের সুযোগ করে দিল। বনগাঁ, গাইঘাটায় শরণার্থীদের ঘনবসতি শুরু হলো। ততক্ষণে শরণার্থীরা বিপুলভাবে সিপিএমের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে।এদিকে বিপুল সংখ্যায় শরণার্থী আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সম্পদের উপর যে চাপ পড়ল তা জনগণের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিল। এরপর ১৯৭৭-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা প্রথম এককভাবে ক্ষমতায় এল। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তিন ধাপে পশ্চিমবঙ্গে যে শরণার্থীরা এসেছেন তাঁদের সর্বস্ব খুইয়ে আসার কারণ তাঁরা হিন্দু এবং তাঁরা ধর্ম পরিবর্তন করতে রাজি হননি। এই কারণটা ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা, মূলত বামপন্থীরা, বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেননি। কারণ ধর্মীয় ভাবাবেগ ভুলিয়ে না দিলে কমিউনিস্ট দল এই বিপুল সংখ্যক হিন্দু ভোটারকে তাঁবে রাখতে পারবে না। সিপিএম ঠিক এই চেষ্টাই শুরু করল। প্রথমে ফলও পেল। তারপর জাতপাতের রাজনীতিতে বিশ্বাসী না হয়েও তারা মতুয়া শরণার্থীদের নিয়ে জাতপাতের কার্ড খেলল।

ইতিমধ্যে মরিচঝাঁপির গণহত্যার একটি বিয়োগান্তক ব্যাপার ঘটল। হ্যাঁ, কমিউস্টিস্টদের মধ্যে একাংশ ভিন রাজ্য থেকে উদ্বাস্তু পরিবারদের পুনর্বাসনের নাম করে মচিরঝাঁপিতে নিয়ে এলো। বামফ্রন্টের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি এতে উৎসাহ নিয়ে এগোলেন। কিন্তু জমিহাঙ্গরদের চাপে এই হতভাগ্য মানুষগুলির নির্মম পরিণতি জ্যোতি বসুর মতো নেতার প্রত্যক্ষ নির্দেশে ঘটেছিল। তারপরেই রাজনীতির আঙিনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন হলো। রাজনীতির ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে টাকা রোজগারের বিভিন্ন কালো দিক উন্মোচিত হওয়ায় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন হলো। ফলে অতি দ্রুত রাজনৈতিক ক্ষমতা বিপুল টাকা রোজগারের উৎস হিসেবে পরিগণিত হলো। প্রথমে রাজনৈতিক নেতারা দালালি নিতে লাগল, যার 'রেট' ক্রমশ বাড়তে লাগল আর তার পোশাকি নাম হলো 'কাটমানি'। আস্তে আস্তে বামফ্রন্টের বকলমে সিপিএমের একদলীয় শাসন কায়েম হওয়ায় এই দলের মধ্যেই দুর্বৃত্তায়ন থেকে তা দুর্বৃত্তের রাজনীতিকরণে পরিণত হলো! এর ফলে জনগণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে লাগল। পুলিশ ও পার্টিকর্মী এই দুয়ের তফাত হলো 'লাইসেন্সড' ও 'আনলাইসেন্সড' সমাজবিরোধী গুন্ডা। জনগণের সঙ্গে রাজনীতিকদের দূরত্ব বাড়তে থাকায় এবং ক্ষমতার মধুভাণ্ড দখলে রাখার তাগিদে নেতাদের ভোটে জেতার আকাঙ্ক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। ভোটরাজনীতি ব্যবসায় পরিণত হলো— যেখানে যো জিতেগা, ওহি সিকান্দার! দেশসেবার জন্য ভোটে দাঁড়ানোর প্রবণতা বন্ধ হলো। ভোটযুদ্ধ জেতার তাগিদে ভোটে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি, কারচুপি, রিগিং ও হিংসার আমদানি ঘটল। আর একে কমিউনিস্টসুলভ কোটিং দিয়ে 'ভোট যুদ্ধ' জেতার জন্য সমস্ত অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আলাদা ভোট মেশিনারি তৈরি করা হলো। যত বেশি নির্বাচন হতে লাগল, জনরোষের প্রতিফলন বন্ধ করার জন্য তত বেশি করে হিংসার আশ্রয় নেওয়া হলো। আর এর জন্য সংবাদমাধ্যমগুলিকে একদিকে ভয় দেখিয়ে ও অন্যদিকে উপঢৌকন দিয়ে ম্যানেজ করা হতে লাগল। এপার শরণার্থীদের অল্প কিছু অনুদান দিয়ে একটা সময় পর্যন্ত ম্যানেজ করা গেলেও, বিশেষত মরিচঝাঁপির পর, তারা ধীরে ধীরে বামফ্রন্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল। তখন সিপিএম 'ইসলামি সেকুলার' বার্তা দিয়ে সরাসরি মুসলমান কার্ড খেলতে লাগল। বিস্তীর্ণ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালানে চক্ষু বন্ধ করে থাকা, বাংলাদেশ থেকে সেখানকার মুসলমানদের ভারতে অনুপ্রবেশ, এসবে নীরব প্রশ্রয় দিয়ে পরে তাদের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড করিয়ে দেওয়া হলো। তাদের দিয়ে অসামাজিক কাজকর্ম করানো এবং বিশেষত ভোটের সময় হিংসায় সরাসরি অংশগ্রহণের মতো কাজকর্মে তাদের যুক্ত করা হতে লাগল।

এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটে হিংসার বাতাবরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তারপর বঙ্গীয় রাজনীতি সিপিএমের 'মেধাবী ছাত্রীর হাতে পড়ে গত দশকে এমন জায়গায় দাঁড়ালো যে, রাজনীতিতে ভোটযুদ্ধ জয় ও তার পরবর্তী সময়ে যুদ্ধজয়ের পরের লুণ্ঠন প্রণালী একটা নির্দিষ্ট রূপ পেল। ফলে 'রাজ' ও 'নীতি' দুটোই হারিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক নেতারা জনগণের কাছে ভালোবাসার জায়গা থেকে সরে গিয়ে ঘৃণার ও ভয়ের পাত্র হয়ে উঠল।

এর পরিবর্তন করতে হলে সংসদীয় রাজনীতির ভোটযুদ্ধে টাকার লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার জন্য যোগ্য এবং অভিজ্ঞ মানুষদের চয়ন করে তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে বসানোর প্রয়োজন। সঙ্গে অবশ্যই কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজবিরোধী মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দলের বিভিন্ন পদের জন্য ফি নেওয়ার কৌশল বন্ধ করতে হবে। আশা করা যায়, একদিনে সমস্ত জঞ্জাল সাফ হবে না। কিন্তু জনসাধারণ যাতে উপলব্ধি করতে পারে যে আগের প্রায় পঞ্চাশ বছরের থেকে পৃথক একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সরকার এসেছে। মানুষের মনে এই ভাবনা না জাগাতে পারলে যত আত্মবিশ্বাসী রাজনৈতিক দল হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হিংসা বন্ধ করে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারবে না।

(লেখক প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক)

বাঙ্গালির উঠোনে অক্ষয় হোক লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

দীপ্তাস্য যশ

রামকৃষ্ণপুর, শ্রীরামপুর, রামরাজাতলার এই পশ্চিমবঙ্গে রাম বহিরাগত নন। যে পশ্চিমবেঙ্গের মাটিতে বাঙ্গালির সব থেকে বড়ো উৎসব, তার মেয়ের ঘরে ফেরার উদ্‌যাপন হয় শ্রীরামের অকাল বোধনের দ্বারা সেই বঙ্গভূমিতে তিনি বহিরাগত নন। তিনি তাদেরই ঘরের ছেলে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি নিশ্চয়ই সবার পড়া আছে। সেই গল্পের সোনাকেও নিশ্চয়ই মনে আছে। সোনা থাকত পদ্মা পাড়ের এক গ্রামে, কিন্তু সেখান থেকে একদিন তাকে শিকড় ছিঁড়ে চলে আসতে হয় এই পশ্চিমবঙ্গে। তারপর নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত পার করে সোনা জাহাজে চাকরি পায়। সেখানে তার কাছে জানতে চাওয়া হয় সে বিফ খায় কিনা। বিফ খেলে তার জাহাজের চাকরি পাকা হবে। সোনা তখন ভাবতে থাকে এই বিফ খাবে না বলেই তো তারা আজ নিজেদের শিকড় ছিঁড়ে নিজদেশে পরবাসী। তার ভাই-বোনেরা হাপিত্যেশ করে বসে থাকে কবে দুবেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পারবে। সবই তো এই বিফ না খেতে চাওয়ার জন্যই। নিজেদের ধর্মরক্ষার জন্যই। তীব্র টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে সোনা। একদিকে তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে ভাইবোনেদের অসহায় মুখগুলো আরেকদিকে তার মাথায় ঘুরতে থাকে অসহায়তার কারণ। সোনার কাছে বিফ খাওয়াটা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মতো এতটাও সোজা ছিল না।

সোনার সঙ্গে অনেকেই নিজের মিল খুঁজে পাবেন। পশ্চিমবঙ্গে তো নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকা মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। নিজেদের ভিটে, মাটি, পুকুর, জমি, তুলসীতলা, দুর্গামণ্ডপ ছেড়ে তারা নিজভূমেই পরবাসী হয়েছিলেন। এমনকী কাউকে নিজের বাড়ির লক্ষ্মীকেও ওপারেই ছেড়ে আসতে হয়েছিল। তারা জানেন গোমাংস না খাওয়ার জন্য, নিজেদের ধর্মরক্ষার জন্য কী অসহ যন্ত্রণা তাদের সহ্য করতে হয়েছে। গোমাংস খাওয়া এবং শুধুই গোমাংস খাওয়া, অন্য কোনো মাংস নয়, যাদের কাছে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতার বিজ্ঞাপন, তারা ঠিক বুঝবেন না এই মানুষগুলোর কষ্ট। এদের রাগ, ক্ষোভ, যন্ত্রণা। এদের অসহায়তা। এদের লড়াই, জেদ, প্রতিজ্ঞা। তারা বুঝবেন না কেন আজ এই মানুষগুলো 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে এককাট্টা হচ্ছে।

বুদ্ধিজীবীবা বলছেন জয় শ্রীরামকে যুদ্ধের স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচ্য বাঙ্গালি এযাবৎ এই ভারত ভূখণ্ডকে কী কী দিয়েছে, কী কী তাকে সহ্য করতে হয়েছে আর তার বিনিময়ে সে ঠিক কী পেয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যদি দেখা যায় দেখা যাবে আন্দামানে কালাপানি পার করে যাঁরা যাবজ্জীবন জেল খেটেছিলেন তাঁদের নব্বই শতাংশই বাঙ্গালি হিন্দু। বাঙ্গালি হিন্দু স্বাধীনতার সংগ্রামে কী না করেছে। সে বোমা মেরেছে, গুলি চালিয়েছে, ফাঁসিতে ঝুলেছে, কালাপানি পার করে জেলে গেছে দেশপ্রেমের অপরাধে। তারা সৈন্যবাহিনী তৈরি করেছে, সেই সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের মাটিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলেছে। নারী, পুরুষ কাতারে কাতারে নিজেদের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার পরিণতিতে দীর্ঘদিনের দাসত্ব ঘুচিয়ে খণ্ডিত হলেও এই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

শুধুই কী স্বাধীনতার সংগ্রাম, নতুন ভারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনেও বাঙ্গালি ছিল অগ্রগণ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এই নতুন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে। পরবর্তীতে সেই ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের মতো মনীষীরা। ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষার সূচনা হোক কিংবা আধুনিক অর্থনীতি ব্যবস্থার সূচনা সবেতেই এই বঙ্গের মাটি থেকেছে পথিকৃৎ। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদ্যমী মানুষের হাত ধরে ভারতবর্ষ একদিকে যেমন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে, অপরদিকে জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো মানুষ দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম হোক বা আধুনিক আত্মনির্ভর ভারতের গঠন, বাঙ্গালি কখনই পিছিয়ে থাকেনি। সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এতো কিছুর পরে স্বাধীন ভারতে হিন্দু বাঙ্গালিরা কী পেল?

একটা পোকায় কাটা জমি। যে মাটির জন্য প্রাণ দিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন, বাঘা যতীনের মতো বিপ্লবীরা— সেই মাটির দুই তৃতীয়াংশ কেড়ে নেওয়া হলো ধর্মের নামে। নিজভূমে অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়ে এসে হিন্দু বাঙ্গালির ঠাঁই হলো শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সংগ্রামের ফসল এই পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু সেখানেও তাদের দিন কাটতে থাকল অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যে। নিজ ভূমেই সে তখন পরবাসী। কখনও তাদের খেদানো হয় দণ্ডকারণ্যের জঙ্গলে আবার কখনও ঠাঁই হয় আন্দামানে। নিজের শিকড় ছিঁড়ে এসে ছিন্নমূল মানুষগুলো কাটাতে থাকল এক মানবেতর জীবন। সে দণ্ডকারণ্যে পেল পোকায় কাটা চাল

আর মরিচঝাঁপিতে পেল বুলেট। তার পিঠে লেগে থাকা কাঁটাতারের ঘায়ের কোনো শুশ্রূষাই হলো না। তারা জীবন কাটাতে থাকল প্রান্তিক মানুষের মতো। এমনকী যার ভিটে মাটি গেল না, দেশভাগের তোড়ে তার সমাজ, তার আর্থিক অবস্থাও নড়বড়ে হয়ে গেল। সবে মিলিয়ে বাঙ্গালি প্রবেশ করল এক অন্ধকার সময়ে। আর রাজনীতির স্বার্থে তাকে ক্রমাগত শুনিয়ে যাওয়া হতে থাকল 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম'। তার কান্না চাপা দিয়ে দেওয়া হলো সম্প্রীতির ঢাকঢোলে। এমনকী তার এই কান্নাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হলো।

দীর্ঘদিনের অভ্যাসে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এটিকেই একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ভেবে নিয়েছিলেন। বাঙ্গালি কিন্তু তার শত্রুকে চিনেছিল। সে ভুলে যায়নি তাদের শত্রুর কথা। তাই তারা যখন দেখল ওপারের পরে এপারেও তাদের জমি দখল হতে শুরু করেছে, যে দুর্গা পুজো করার অধিকারের জন্য সে ওপার থেকে এপারে চলে এসেছে, সম্পন্ন পরিবার হয়েছে ভিখারি, সম্পন্ন চাষি হয়েছে মুটে মজুর— তাদের সেই অধিকারও ক্রমশ বিপন্ন হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গেরই নানা প্রান্তে, কখনও কোথাও স্লোগান উঠছে 'আর্য জাতি ভারত ছাড়ো', আবার কখনও বা তারই চোখের সামনে তার কলেজ পড়ুয়া মেয়েটা নৃশংস অত্যাচারের শিকার হচ্ছে বর্বরদের হাতে, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান 'দুধেল গোরুদের লাথি' খাওয়ার নিদান দিচ্ছেন, বাধা দিচ্ছেন পুজোর নির্ঘণ্ট পালনে— তখন সে বুঝল আবারও এই ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সময় আসন্ন।

কারণ তারা তো দেখেছে সুপরিকল্পিতভাবে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে কীভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবিকার সুযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কীরকম চতুরতার সঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়েছে কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি। তার জেরে ভেঙে পড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। এই দুইয়ের জেরে ভেঙে পড়েছে বাঙ্গালির সমাজও। তারা বুঝল এবার তাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে, দেওয়ালে পিঠ তার অনেক আগেই ঠেকেছিল, কিন্তু এবার যদি ঘুরে না দাঁড়ায় তাহলে এই দেওয়ালেই চাপা পড়বে। তাই মরিয়া হয়ে লড়াই শুরু করল। আর সেই লড়াইয়ের প্রতীক হলো দুইটি শব্দ— 'জয় শ্রীরাম'।

একবার ভেবে দেখুন তো মেটিয়াবুরুজের সাফাই কর্মচারী সেই মানুষটি, যিনি আজও মাঝে মাঝেই ভুল করে মেয়ের জন্য চকোলেট কিনে আনেন। কিংবা বীরভূমের সেই মায়ের কথা। যিনি আজও ভাবেন মেয়েটা বেঁচে থাকলে এবছরে তার কলেজের পড়াটা শেষ হতো। একটু ভাবুন সেই মেয়েটির কথা, যে ভাবে দাদা থাকলে আজ যখন সে শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে তখন দাদার বুকে মাথাটা গুঁজে দিয়ে একটু কাঁদতে পারত। ভাবুন একবার সেই ছেলেটির কথা যার চাকরির বয়স একটু একটু করে পেরিয়ে যায় আর সে অসহয়ের মতো দেখতে থাকে তার থেকে অনেক কম যোগ্যতার একজন শুধুমাত্র একটি সংরক্ষণের জেরে তার প্রাপ্য চাকরিটি বাগিয়ে নেয়।

একটু ভাবুন এই মানুষগুলোর এখন চাহিদা কী? তাদের একটাই চাহিদা। বিচার। কিন্তু কে দেবে সেই বিচার? এই প্রশাসন? যারা ধুলাগড়, কালিয়াচক, বসিরহাট, তেলিনীপাড়া সবকিছুর পরে আমাদের নিদান দেয় 'দুধেল গোরুর লাথি' খাওয়ার। এরপরে যদি তার মনে প্রশ্ন জাগে সম্প্রীতির সব দায় কেন শুধু তাদেরই, তাহলে কি সেই প্রশ্ন খুব অসঙ্গত? সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় কার? এই বুদ্ধিজীবীদের নয় কি? কিন্তু তারা উত্তর পাচ্ছে না এবং বুঝতে পারছে যুদ্ধের সময় উপস্থিত। এবার তাদের মরণ কামড় দিতেই হবে। নচেৎ অস্তিত্বই থাকবে না নিজেরই ভূমিতে। এখন তারা বুঝে গেছে, সম্প্রীতি নয়, যুদ্ধই পথ। তাই তো রণহুঙ্কার দিয়ে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করছে। তারা যে এই মাটিরই ভূমিপুত্র তা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই বুদ্ধিজীবীদের, ভণ্ড সম্প্রীতিবাজ রাজনৈতিকদের এই 'জয় শ্রীরাম' শব্দবন্ধের মাধ্যমে। এই শব্দ দুটি তাদের কাছে কোনো নিছক রাজনৈতিক স্লোগান বা ধর্মীয় স্লোগান নয়। এই শব্দবন্ধ তাদের অস্তিত্বের ঘোষণা। অবশ্যই জয় শ্রীরাম এখন বাঙ্গালির 'ওয়ার ক্রাই' বা রণহুংকার। বাঙ্গালি আরও একবার শিকড়চ্যুত হতে রাজি নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন বাঙ্গালির যুদ্ধের আয়োজনে কেন এই স্লোগান। তাহলে তাকে সবিনয়ে বলব, রামকৃষ্ণপুর, শ্রীরামপুর, রামরাজাতলার এই পশ্চিমবঙ্গে রাম বহিরাগত নন। যে পশ্চিমবেঙ্গের মাটিতে বাঙ্গালির সব থেকে বড়ো উৎসব, তার মেয়ের ঘরে ফেরার উদ্‌যাপন হয় শ্রীরামের অকাল বোধনের দ্বারা সেই বঙ্গভূমিতে তিনি বহিরাগত নন। তিনি তাদেরই ঘরের ছেলে।

বাংলাভাষী মাত্রেই কি বাঙ্গালি? না। বাঙ্গালির দুর্গাপুজো থাকবে। বাঙ্গালির সরস্বতী পুজোতে হলুদ শাড়ি থাকবে। বাঙ্গালির উঠোনে তুলসীতলা থাকবে। বাঙ্গালির রান্নাঘরে নবান্নের নতুন চালের গন্ধ থাকবে। বাঙ্গালি তার ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় যমের দুয়ারে কাঁটা ফেলবে। এই সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ধারক বাহকরাই বাঙ্গালি। অন্যরা বাংলাদেশি হতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালি নয়। তাই এই মাটির উদ্‌যাপন যে করে তারই এই মাটিতে অধিকার সর্বাগ্রে।

যদি কেউ বলেন এই দেশ অহিংসার দেশ, তাহলে তাকে সবিনয়ে মনে করিয়ে দেব এই দেশের ইতিহাস গত একশো বছরের নয়, এই বঙ্গভূমির ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের। শ্রীরাম এই দেশের প্রাণপুরুষ। যিনি নিজের স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষায় অস্ত্র হাতে নিতে দ্বিধা করেননি। এই দেশ শ্রীকৃষ্ণের দেশ। যিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন, অহিংসা পরম ধর্ম হিংসা তথৈবচঃ। অর্থাৎ অহিংসার পথ সর্বদাই শ্রেয়, তেমনিই ধর্ম রক্ষার্থে হিংসার পথ শ্রেয়। আমাদের ধর্ম কী? আমাদের ধর্ম এই মাটির যে হাজার বছরের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য তাকে রক্ষা করা। আমাদের ধর্ম এই মাটিতে তার ভূমিপুত্রদের অধিকারকে বজায় রাখা। তাই আজ আমাদের যুদ্ধে নামতে হবে আর এই যুদ্ধে আমাদের রণহুংকার 'জয় শ্রীরাম'। তাই তো এই শব্দবন্ধের গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম। তা রণক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র দিলে যে তার অমর্যাদা হয় তাও আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা এসপার ওসপারের লড়াইতে নেমেছি। যদি আমরা থাকি এই দেশ থাকবে, এই বা বঙ্গভূমি থাকবে। আমাদের লক্ষ্মীর পাঁচালি থাকবে, কালী পুজো থাকবে। আমাদের ধানের মড়াই থাকবে। আমাদের ঘরের ছেলেরা ঘরে থাকবে। আমাদের মা লক্ষ্মীরা নিরাপদে থাকবে। আর সর্বোপরি এই মাটি আমাদের থাকবে। আর এই মাটিতে থাকবে আমাদের শিকড়। আমাদের আর ছিন্নমূল হতে হবে না।

যুদ্ধ শেষে আমরা থাকি বা না থাকি এই মাটি আমাদের থাকা চাই। তাই তো আজ হিন্দু বাঙ্গালিরা একসঙ্গে একসুরে বলছি 'জয় শ্রীরাম'।

(লেখক বিশিষ্ট সমাজসেবী)

কৃষি বিল নিয়ে কেন্দ্রের ভাবনায় যুক্তি আছে

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

আজন্ম কলকাতার নাগরিক হয়ে স্কুলের এক্সকারশনে প্রথম ন'বছর বয়সে ধানগাছ দেখা মানুষ আমি। তাই কৃষি নিয়ে বিশেষজ্ঞের মত দেওয়ার আগে নিজেকে বিশেষ অজ্ঞ ভাবতে ভালো লাগে। তাই কিছু লিখতে ভয় করে। অথচ ধানগাছ তিলগাছের তফাত না জানা, চা গাছকে বুশ অর্থাৎ ঝোপ এবং একরকে দৈর্ঘ্যর একক বলা এক কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপককেও দেখেছি, তিনি এখন এক লক্ষ টাকা পেনশন পান। তাই বর্তমান কৃষি বিল নিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে বাঁশরিতে পাখোয়াজ বাজানোর সমান হতে পারে ভেবে আমার এক কৃষিকাজে যুক্ত সহকর্মীর অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করি। বন্ধুটি বিশ্বভারতীর এমএ (অর্থনীতি) এবং লাভপুরে বরাগ্রাম নিবাসী। সারা জীবন বোলপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত এক ব্যাঙ্কে চাকরি করে বর্তমানে কিছু জমি বর্গা দিয়ে পাঁচ বিঘে জমিতে ধান চাষ করে। এবছর সে চার হাজার টাকা লাভ করেছে। গত বছর করেছিল ১২ হাজার টাকা। বন্ধু বলল, 'বুঝতেই পারছো কৃষিকে কেন অলাভজনক বলা হয়। আমার তো তবু পেনশন আছে, যাদের নেই তাদের কথা ভাবো তো'। জানতে চাইলাম কেন সরকার যে বলছে মান্ডি হয়েছে সেখানে পরিপোষক মূল্য অর্থাৎ minimum support price পাচ্ছো না? উত্তরে বন্ধু জানালো MSP-তে বেচতে হলে দালাল ধরতে হবে, নচেৎ অপেক্ষা। ওর মান্ডিতে বেচার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হয়েছে ২৩৯০। খবর নিয়ে জেনেছে ওর টার্ন আসতে আসতে শ্রাবণ মাস হবে।

আমার বন্ধুটি অবস্থা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত। আমাদের রাজ্যে প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষি বেশি। তাদের শ্রাবণ পর্যন্ত অপেক্ষা সম্ভব নয়। পাওনাদার শ্রাবণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। তাই এ বছর MSP Rs. 1870.00 হলেও Rs. 1250.00 এ বেচতে হচ্ছে

তাদের। অর্থনীতির কেতাবি সংজ্ঞায় একেই distressed sale বলে।

দালাল বা ফড়ে রাজ :

কোনো 'ক' বাবু 'খ'-এর থেকে তার ব্যাঙ্কের পাশবই ও আধার কার্ড নিয়ে মান্ডিতে তাকে ২৫ কুইন্টাল ধান বাবদ (ধরা যাক ৪৫০০০.০০ টাকা মূল্যের ধান) দু' হাজার টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট দিনের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সংগ্রহ করল। ধান নিল না। পরে সেই নাম্বারের দিন এলে 'ক' বাবু কোনো 'গ'-এর থেকে ৩০০০০.০০ টাকায় কেনা ২৫ কুইন্টাল ধান মান্ডিতে ৪৫০০০.০০ টাকায় বেচে দিল। সেই মরশুমে 'খ' তার ধান মান্ডিতে বেচার অধিকার হারাল, কারণ ধান বেচার অধিকার সে দু' হাজার টাকার বিনিময়ে 'ক'-কে দিয়ে দিয়েছে। এই কাজ 'ক' কেবল 'খ'-এর আধার কার্ড পাসবই নিয়ে করছে না। এক একটা ব্লকের প্রায় শ'দুয়েক চাষির মধ্যে তার ক্ষমতা মতো অনেকের সঙ্গেই করছে। এটাই তার পেশা। সারা পশ্চিমবঙ্গে 'ক'-দের সংখ্যা অসংখ্য।

শহরে রেশনে বিনা মূল্যে পাওয়া চাল, গম 'গরিব' x ইদানীং সাধ্যমত করছে। এখানে সে নিজেই 'ক' ও 'খ'। এখানে কোনো msp নেই, মান্ডিও নেই। মান্ডি কেন্দ্রিক ধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প সংখ্যক মান্ডির দরুন একটা নকল monopsonistic market বানানো হয়েছে, যেখানে বৈধ ক্রেতা একজন কিন্তু বিক্রেতা অনেক। brisk season-এ আমাদের দেশে চাষের (বিশেষ করে দানা শস্যের) এই চিত্র কম-বেশি সকলেরই জানা।

আলোচ্য কৃষি বিল নিয়ে কৃষকদের অন্যতম দাবি :

আলোচ্য কৃষি আইনে কৃষকদের মান্ডির বাইরে পণ্য বিক্রয়ের কথা বলা আছে। পঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকদের শঙ্কা ফার্ম গেট থেকে শস্য কেনার ব্যবস্থা এমএসপি উৎখাতের পূর্বসূত্র। তারা চায় মান্ডি থেকে মুক্তি নয়, মান্ডির উন্নয়ন। অপারেশন বর্গার সময় পুরন্দরপুরে ব্যাঙ্কের ঋণদানের সময় দেখেছি কেমন অস্থায়ী ভাটিখানা বসে যায়। চাষের (উৎপাদনের) জন্য দেওয়া ঋণ চাষি মদ্যপানে (ভোগে) ব্যবহার করে। সুসংগঠিত ও পর্যাপ্ত মান্ডি হলে আমাদের 'ক' বাবুদের সুবিধা হবে। তাই মান্ডি-ফড়ে আঁতাত ভাঙতে সরকারি উদ্যোগে মান্ডি গড়া অপেক্ষা বাজারকে শক্তিশালী করে এপিএমসি আইন সংস্কার করা বেশি কার্যকরী এবং কৃষির দীর্ঘস্থায়ী সমাধান বলে বর্তমান সরকার মনে করে। নীতিগত ভাবে ২০১৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেস দলও এই আইন বাতিল করে কৃষিকে আরও বাণিজ্যমুখী ও বাধামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নাগরিকত্বের মতো এক্ষেত্রেও তাই তারা দোলাচলে। অস্তিত্বের সংকটে ভোগা অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও সরকার ও আন্দোলনরত চাষিদের মধ্যে গড়ে ওঠা এক ধরনের communication gap-কে কাজে লাগাতে চাইছে।

মান্ডি বা এমএসপি ছেড়ে আমরা যদি অন্য ক্যাশ ক্রোপ, তৈলবীজ, পোলট্রি বা

ডেয়ারিজাত পণ্যের কথা ভাবি তা হলে নতুন নীতির যৌক্তিকতার অনেক অবকাশ আছে। চিরকাল অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় কৃষির প্রোডাক্টিভিটি অনেক কম বলে আমাদের লজ্জা সুবিদিত। স্বামীনাথনের সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি এবং কুরিয়েনের সমবায়জাত শ্বেতবিপ্লব প্রযুক্তি সেই লজ্জা কিছুটা হলেও কমিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ এই সাফল্যকে ধরে রাখতে second and third generation reform-এর কথাও বারংবার বলেছেন। কৃষিকে শিল্পের স্তরে আনতে হলে বা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে বিপণন ও রপ্তানির কথা ভাবতেই হবে। এবং সেক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে সরকারি উদ্যোগের বস্তাপচা গুণগান করা উটপাখি হয়ে ধূলিঝড় মোকাবিলার সমান। বিশ্বে ফসল উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রেই ভারত প্রথম স্থানে, পশু ও ডেয়ারি উৎপাদনেও তাই। মার্কিন দেশে ভারতীয় দুধ ও দুগ্ধজাত বস্তু অনেক বেশি দামে আদৃত। এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত কৃষকরা সহজবোধ্য কারণেই পঞ্জাব হরিয়ানার আন্দোলনকারীদের মতো সরব নয়।

পঞ্জাবের মান্ডি ব্যবস্থা ও তাতে সরকারি অংশগ্রহণ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ইউপির তুলনায় অনেক সুসংহত। farm size ও অনেক বড়ো। বিহারে যেটা ১ হেক্টর (পশ্চিমবঙ্গে আরও কম), পঞ্জাবে তা ৩.৬ হেক্টর। এই জন্যই পঞ্জাবে capitalist farming এবং চাষে যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেশি ও সফল। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে ভাকরা- নাঙ্গলের অবদান। বলা যায় প্রাকৃতিক ভাবে হিমাচল পুষ্ট করেছে জল দিয়ে পঞ্জাবকে, যেমন নিজে উষর বালুময় মরুতে থেকে রাজস্থান সবুজ করেছে পঞ্জাবকে। লেখার শুরুতে উল্লেখিত বন্ধুটি তার ব্যাঙ্কের কাজে কৃষিতে ব্যাঙ্কের রেভিনিউ লিকেজ সংক্রান্ত কাজে পঞ্জাবের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল। সে অবাক হয়েছিল সেখানকার কৃষকদের দেওয়া ঋণের পরিমাণ দেখে। পশ্চিমবঙ্গে তার ব্যাঙ্ক একর পিছু ঋণ দেয় উৎপাদিত ফসলের মূল্যের ভিত্তিতে। পঞ্জাবে দেওয়া হয় জমির মূল্যের ভিত্তিতে। তাই পশ্চিমবঙ্গে দু' একর জমির মালিক যেখানে ৫০ হাজার টাকা ঋণ পায়, পঞ্জাবের মালিক পায় দু' কোটি।

এই কৃষি নীতির সমালোচনায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের দুর্দশার প্রশ্নটাও উঠে আসছে। কৃষিকে কেবলমাত্র ধান গমের মধ্যে না রেখে ডেয়ারি, পোল্ট্রি, বাগিচাকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে সেখানে ছোটো ও অল্পসংখ্যক উৎপাদকরাই মুখ্য খেলোয়াড়। এবং সমগ্র কর্মকাণ্ডটাই বেসরকারি স্তরে ঘটে। সমীক্ষায় দেখা গেছে আমূল, নেসলে, হাডসনের মতো বড়ো বড়ো বেসরকারি উদ্যোগগুলির দুগ্ধ সরবরাহকারীদের ৯০ শতাংশই দুশো একশো গোরুর মালিক নয়। সেই সঙ্গে দেখা যায় ডেয়ারি পোলট্রির ৯৫ শতাংশ বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত। এছাড়া পরিসংখ্যান বলে এই ক্ষেত্রগুলির বৃদ্ধির হার দানা শস্যের তিন গুণ। দুধের দামও আখ ও দানা শস্যের মিলিত মূল্যের তিনগুণ। পোলট্রির ক্ষেত্রে পাঁচ গুণ এবং মাছের ক্ষেত্রেও তাই। এই কারণে নগদ শস্য উৎপাদক রাজ্যগুলির অংশগ্রহণ এই আন্দোলনে সীমিত।

হাড় হিম করা ঠাণ্ডায় রাতের পর রাত সিংঘু সীমান্তে অবস্থান করা কৃষকদের অন্যতম দাবি বিদ্যুৎ বিল ও বিচালি জ্বালানো মাশুল প্রত্যাহার। পঞ্জাবে সরকারকে কেবল বিদ্যুৎ ও সার বাবদ পরিবার পিছু বছরে ১, ২২,০০০.০০ টাকা ভরতুকি দিতে হয়। সেখানে রাজ্য সরকারও রাজনৈতিক কারণে এই দাবির বিরোধী নয়। এখানে উল্লেখ্য ঋণের হিসেবে পঞ্জাব দেশের শীর্ষে। পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও পঞ্জাবের debt-gdp ratio বেশি। (পশ্চিমবঙ্গের ৩৯ শতাংশ, পঞ্জাবের ৪০ শতাংশ)। কলকাতা শহরে ফুটপাত দখল করা হকারদের বেআইনি বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করার মতোই কঠিন কাজ বিদ্যুতের প্রশ্নে কিষানদের বিরুদ্ধে যাওয়া।

সব শেষে চুক্তি চাষে জমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়ার প্রশ্ন এবং এই প্রসঙ্গে নীল চাষের তুলনা করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বিলম্বিত সংস্কারের সময়েও ব্যাঙ্ক বিমা, খুচরো ব্যবসা, মোটর ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে এবং এস ই জেডের ক্ষেত্রে এমন আশঙ্কা করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, মৌমাছি মধু পান করলেও ফুলকে আহত করে না। ভারতীয় কৃষিতে বহুজাতিক সংস্থা যদি তেমন ক্ষতি করে সেক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা পালন করতেই হবে। একই সঙ্গে কৃষিকে কেবল way of life নয়, mode of business করতেই হবে। এটা করা হয়নি বলেই সাংহাইয়ের বাজারে আমাদের মতো banana republic-এর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ফিলিপিনের কলা অনেক বেশি দামে একজন চীনাকে কিনতে হয়। আমস্টারডামে ব্রাজিলের যে আম বিক্রি হয় তার স্বাদ ও গুণমান আরামবাগের শাঁখালুর চেয়ে বেশি নয়। এমনকী দার্জিলিংয়ের কমলালেবু চোরাপথে বাংলাদেশ হয়ে দুবাই চলে যায়। কলকাতার বাজারে বেশ ক'বছর দার্জিলিং লেবু তেমন মিলছে না। স্কুল জীবনে পিছনে হাত বেঁধে ছুটে গিয়ে মাটির সরা থেকে কমলালেবু মুখে নিয়ে দৌড়নোর সময় যে গন্ধ নাকে লেগে থাকত তা এখন কষ্ট কল্পনা।

একটা কথা আন্দোলনরত পঞ্জাবের কৃষক ও সরকার দু' পক্ষকেই মানতে হবে। ভারতবর্ষ শ্রীলঙ্কা নয়, নেদারল্যান্ডসও নয়। অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের এই দেশে অভিন্ন কারেন্সির মতো শিক্ষানীতি এমনকী শিল্পনীতি প্রণয়ন চলতে পারে কিন্তু কৃষি নীতি প্রণয়নে অনেক বেশি সতর্কতা দরকার। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে এই অসাধ্যসাধনটি আম্বেদকর করেছিলেন। ভূমি চরিত্র পশ্চিমবঙ্গে এবং রাজস্থানে এক নয়, তেমনই কেরলের রাবার, কর্ণাটকের কফির সঙ্গে কাশ্মীরের জাফরান, অসমের চা, হিমালচলের আপেল, মণিপুরের আনারস, মহারাষ্ট্রের কলা, আঙুর বা ইউপি-র আম, এমনকী দার্জিলিংয়ের রোডোডেনড্রন- জাত পানীয়র সম্ভাবনা স্থান নিরপেক্ষ নয়। আশা করব এই কৃষিনীতি নিয়ে দু'পক্ষই অনমনীয় অবস্থান থেকে সরে এসে কাঙ্ক্ষিত সমাধানে পৌঁছবে।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং প্রাক্তন অধ্যাপক)

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে

রামানুজ গোস্বামী

এই প্রবন্ধটির আর কোনও ভূমিকার প্রয়োজন নেই। কারণ গত কয়েকদিন আগে ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে গৌরবময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তার চরম মর্যাদাহানি ঘটেছে। এই ঘটনার সাক্ষী শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারত এবং সমগ্র বিশ্ব। ঘটনাটি এই যে, সেদিন ওই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও আমন্ত্রিত ছিলেন। মাইকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা হতেই উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মধে কয়েকজন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে থাকেন। উদ্যোক্তারা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের শান্ত করবার যথেষ্ট চেষ্টাও করেন। বোঝাই যায় যে, যেহেতু এর আগে নেতাজীর জন্মদিনে ভারতের আর কোনও প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এসে নেতাজীকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেননি, তাই এই দিনে কলকাতায় মোদীজীকে দেখে জনগণ আপ্লুত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, শুধুমাত্র যে ভিক্টোরিয়াতেই এই ধ্বনি দেওয়া হয়েছে, এমন নয়, মোদীজী কলকাতায় আসবার পরে এইদিন যখনই বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন তখনই উৎসাহিত কিছু মানুষ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে। এতে তো কোনও ব্যক্তিকেই অপমান করবার প্রশ্ন নেই। তাছাড়া, ভগবান শ্রীরামের নাম তো ভারতের যে কোনও হিন্দু যখন খুশিই নিতে পারে— কারণ, শ্রীরাম হলেন ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক। ভারতের বহু অঞ্চলে তো কথার শুরুতে ও শেষে শ্রীরমের নাম করা হয়। মুশকিল হলো যে, এক ও একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বর্তমানে ভগবান শ্রীরামের নাম সর্বসমক্ষে বা প্রকাশ্যভাবে করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা আবশ্যক। কারণ তা না হলে বর্তমান রাজ্য সরকার ও রাজ্য প্রশাসনের রোষানলে পড়তে হতে পারে। আমরা তো এর আগেও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখেছি। এই দিনও ঠিক তেমনটাই ঘটল। তীব্র প্রতিক্রিয়া ও আপত্তি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তার সঙ্গে তিনি 'জয় বাংলা' ধ্বনিও দিলেন, যা কোনও ভাবেই ভারতীয় স্লোগান নয়। এতেই না থেমে তিনি নেতাজীর জন্মদিনে কোনও কথা না বলে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু এই আচরণে প্রকৃতপক্ষে যেটি হলো, তা হচ্ছে সারা পৃথিবী এটাই দেখল যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নেতাজীর জন্মদিনে সামান্য, তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে মেজাজ হারিয়ে ফেললেন। তিনি 'জয় পশ্চিমবঙ্গ' না বলে বললেন 'জয় বাংলা'।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই তৃণমূলিরা-সহ বামপন্থী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং কয়েকটি সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল এটাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়েছে যে, সেইদিন পশ্চিমবঙ্গকে অপমান করার সঙ্গে নেতাজীকেও অপমান করা হয়েছে। কিন্তু সেদিন কোথাও কোনও 'গো ব্যাক' স্লোগানও ছিল না বা কালো পতাকাও ছিল না। তবু এটা আরও একবার প্রমাণিত হলো যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে হিন্দুরা যথেষ্ট আশঙ্কার মধ্যেই রয়েছে। যেখানে প্রকাশ্যে সরকারি অনুষ্ঠানে 'আল্লার কাছে প্রার্থনা' করা হয় এবং সর্বসমক্ষে শ্রীরমের নিন্দা করা হয়, রামধনু বদলে হয় রংধনু, শ্রীরামকে বলা হয় 'যাযাবর' ইত্যাদি আরও কত কী, সেই রাজ্যে বর্তমানে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা সত্যিই কি নিরাপদ? এই প্রশ্ন তাই উঠেছে। লজ্জার ব্যাপার হলে এই যে, বাক্‌স্বাধীনতার নামে হিন্দুবিদ্বেষী মতাদর্শ তথা মতামতও এই রাজ্যে সরকারি স্তর থেকে প্রশংসিত হয়। কিন্তু কোথাও কোনও মুসলমান-বিদ্বেষ, খ্রিস্টান বিদ্বেষ বা অন্য কোনও ধর্মের প্রতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং এই যে পক্ষপাতমূলক আচরণ, তা যে সর্বৈব ভাবেই ভোটের জন্য, তা তো বলাই বাহুল্য।

> **এখনও যদি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের সচেতন করতে না পারেন, তবে আগামীদিনে এখানকার হিন্দুদের অবস্থা আরও শোচনীয় হতে পারে। তখন শুধুমাত্র শ্রীরামনাম নয়, সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিতেই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।**

পরিশেষে একটা ব্যাপার এক্ষেত্রে উল্লেখ করতেই হয়। মুখ্যমন্ত্রী দেশে শুধুমাত্র দিল্লি কেন রাজধানী হবে, সেই প্রসঙ্গেও আপত্তি তুলেছেন। তিনি অন্তত চারটি রাজধানীর প্রস্তাব রেখেছেন। ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে এই সব রাজধানীগুলিকে সংসদের নানা অধিবেশনের কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু মনে হয় যে, এর ফলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, তার দিকে মুখ্যমন্ত্রী নজর দেননি। তাছাড়া, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তথা ঐক্যবোধের ভাবনাও এর ফলে বিপদের মুখে পড়বে। কারণ আজ যদি তামিলনাড়ুতে রাজধানী স্থাপন করে সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়, তবে তো দক্ষিণেরই আরও একটি রাজ্য কেরল থেকে এই দাবি উঠতেই পারে যে, কেন কেরলে রাজধানী হবে না? সুতরাং এই দাবি হাস্যকর।

এবারে শেষ কথা। সামনেই আসছে নির্বাচন। এখনও যদি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের সচেতন করতে না পারেন, তবে আগামীদিনে এখানকার হিন্দুদের অবস্থা আরও শোচনীয় হতে পারে। তখন আর শুধুমাত্র শ্রীরামনাম নয়, সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিতেই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। শিবলিঙ্গ হতে পারে কলুষিত। দুর্গাপুজোয় চলতে পারে গোমাংস ভক্ষণ। একথা বলবার কারণ এই যে, ইতোমধ্যেই দুর্গা পুজোয় গো-মাংস ভক্ষণ ও রন্ধনের কথা কেউ কেউ বলেছেন। তাই অবিলম্বে হিন্দুদের সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

জয়শ্রীরাম ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত কেন?

মণীন্দ্রনাথ সাহা

২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম বর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় এসে প্রথমে এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে যান। সেখানে সবকিছু ঘুরে দেখে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসেন। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আসেন প্রধানমন্ত্রী। এখানে তিনি 'নির্ভীক সুভাষ' নামে সুভাষচন্দ্রের জীবনের ১২৫টি তথ্য সম্বলিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পরে নেতাজীর ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে ডাক টিকিট ও মুদ্রার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি তিনটি ভাষাতেই নেতাজীর ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ এর মধ্যে লেখা চিঠি সংবলিত বই প্রকাশ করেন। সেই সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পর তিনি উঠে দাঁড়ানো মাত্র দর্শকাসন থেকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি উঠল। আর এতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে হিন্দিতে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন— 'এটা সরকারি অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক নয়। আমাকে ডেকে এনে অপমান করা হলো, বাঙ্গলার অপমান করা হলো, নেতাজীকে অপমান করা হলো। —বলে বক্তব্য না রেখেই বসে পড়লেন।

এখন প্রশ্ন হলো— মাননীয়ার কার ওপরে এই দোষ আরোপ করতে চাইছেন? 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনি তো দর্শকাসন থেকে উঠেছে। আবার হিন্দু আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্র। তাঁর নামে যদি কেউ জয়ধ্বনি দেয় তা কি খুব অন্যায়? তাহলে কি এরাজ্যে হিন্দুরা রামের নাম করতে পারবে না?

আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াই করেছেন। তিনি নানান বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সেখানে শুধুমাত্র রামের নামে জয়ধ্বনি দেওয়াতেই তাঁর সমস্ত মান-সম্মান ভুলুণ্ঠিত হলো? তাঁর মানসম্মান কী এতই ঠুনকো? উপরন্তু 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি যদি নেতাজীর মতো দেশপ্রেমিককে এবং বাঙ্গলাকে অপমানিত করে তাহলে কার নামে জয়ধ্বনি দিলে নেতাজী এবং পশ্চিমবঙ্গের মান বজায় থাকবে?

'জয় শ্রীরাম' একটি ধর্মীয় স্লোগান। এটা কোনও রাজনৈতিক স্লোগান নয়। আর রামচন্দ্র কোনও একটা দলের, একজন ব্যক্তির নিজস্ব দেবতা নন। তিনি সকল ভারতবাসীর। তাই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলে মুখ্যমন্ত্রী কেন মেজাজ হারাবেন, এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক। এখন তো কিছু তৃণমূল নেতাও রামনবমীর পুজো করেন। এর আগেও একাধিকবার তিনি এই ধ্বনি শুনে মেজাজ হারিয়েছেন। মেদিনীপুরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়া দুই যুবককে পুলিশ দিয়ে জেলে পাঠিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে যাওয়ার পথে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে গাড়ি থেকে নেমে দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন। তখনও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদিনের সভায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী মেজাজ হারিয়ে বক্তব্য না রেখেই বসে পড়া কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তাঁর আরও ধৈর্যশীল হওয়া উচিত ছিল।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন— 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলে মাননীয়া কেন মেজাজ হারাবেন? তিনি কী চান? রহিমের নামে জয়ধ্বনি দিলে তিনি খুশি হবেন?' সাধারণ মানুষও বলাবলি করছে— 'তৃণমূল-সহ বিজেপি বিরোধীরা যেন মনে রাখেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করেছেন কয়েকজন বজ্জাত রাজনীতিক। তার একভাগ মুসলমানদের জন্য অপর ভাগ হিন্দুদের জন্য। এই কথাকে সামনে রেখেই জিন্না দেশভাগ চেয়েছেন এবং ভাগও করে নিয়েছেন। উপরন্তু হিন্দু বজ্জাত রাজনীতিকরা সমগ্র বঙ্গকে জিন্নার হাতে তুলে দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু মহান দেশপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জিন্নার হাত থেকে এই পশ্চিমবঙ্গকে কেড়ে নিয়েছেন শুধুমাত্র বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। তাই পশ্চিমবঙ্গে বসে রাজ করতে পারছেন মমতা ব্যানার্জি, বড়ো বড়ো বাণী বিতরণ করতে পারেন অধীর চৌধুরী, সুজন চক্রবর্তীরা।

সাধারণ মানুষ আরও বলছেন— 'এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে এবং সমগ্র ভারতে হিন্দুরা যেখানে খুশি সেখানে, যখন খুশি তখন তাদের আরাধ্য দেব-দেবীর নামে জয়ধ্বনি দিবেন। সেই ধ্বনি শুনে যদি কারো মনোকষ্ট হয় তাতে হিন্দুদের কিচ্ছু যায় আসে না।' ▯

মাননীয়াকে খোলা চিঠি

আপনি আমাদের এই পোড়া বাঙ্গলার গর্ব! এই মুহূর্তে হাতের কাছে আমাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করার মতো যাই বলুন না কেন, অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী আপনি। আপনার একই অঙ্গে এত গুণ— যে সেটা লিখে শেষ করা যাবে না! এতদিন আপনি প্রত্যেকটা প্রশাসনিক বৈঠক শুরু করতেন 'জয় বাংলা' ও আল্লাহ্-এর নাম নিয়ে। সেই সঙ্গে দলীয় কর্মসূচিগুলোকে কার্যকর করার জন্য সরকারি বা প্রশাসনিক মঞ্চগুলোকে তো পাখির চোখ করে ব্যবহার শুরু করেছেন আপনি ক্ষমতায় আসার সূচনালগ্ন থেকেই। আপনার জল্লাদ ভাই- ভাইপোরা তো বঙ্গবাসীর মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দিয়েছিল। যাইহোক, ২০১৯-এর লোকসভা ভোট আপনার লাগানো লিউকোপ্লাস্টকে আলগা করে দিয়েছে। বিশেষকরে চন্দ্রকোণার ঘটনা সেই যে আপনার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরকে লিক করে দিয়েছে, সেই লিক এখন সর্বব্যাপ্ত হয়ে আপনার 'ঢপের চপ' শিল্পের উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থেকে বেপথু হওয়ার মুখে! বাঁধভাঙা বন্যার জল এবার যে নবান্ন ও হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের টালির চালের ঘর ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে সেটা অনুভব করে নেতাজী জয়ন্তীর দিনে নেতাজীকেও অপমান করতে আর ছাড়লেন কোথায়! যে 'জয়হিন্দ' ধ্বনি শুনে বাঙ্গালি-সহ সারা ভারতবর্ষ উদ্বেলিত হয়ে ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য নিজের আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বা করতে উদ্যত হয়েছিলেন তাঁদেরকেও আপনি অপমান করতে ছাড়েননি 'জয় বাংলা' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। বাঙ্গালি আজ আপনার অভিনয় বুঝে ফেলেছে যে, আপনি তলে তলে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ করার মতলব করছেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন বা সাধ তো আপনার প্রিয়জনের কবরে সেই কবেই সিঁধিয়ে গিয়েছে। এবার যদি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে যোগ করে বৃহত্তর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়, সেই প্রচেষ্টা এখন সুচতুরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন! পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আরও ২৭টি রাজ্য আছে, তারা কিন্তু কেউই নিজ নিজ রাজ্যের নামে জয়ধ্বনি দেয় না, তাদের প্রয়োজনও নেই। তারা সবাই নিজেদের 'জয়হিন্দ' অন্তপ্রাণ বলেই মনে করে বলে তাদের রাজ্যের জন্য আলাদা করে স্লোগান নেই।

আপনি নিজেকে নেতাজী-স্বামীজী-রবিঠাকুর-সহ সব মনীষীর সম পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বলে তবেই না নিজেকে 'বাংলার গর্ব' বলে আত্মপ্রচারে নেমেছেন। বাংলা বলে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রদেশ ভারতে না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা নাম দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি ক্রমপ্রকাশ্য। আপনার প্রশাসনিক সভাগুলোতে রুটিনমাফিক আল্লাহ্ ও জয় বাংলা নাম নেওয়ার যে অভ্যাস করে ফেলেছেন, তাতে বাঙ্গালি জাতীয়তা-বাদীরাও আপনাকে দেখলেই 'জয় শ্রীরাম' উচ্চারণের অভ্যাস করে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের 'তুই তোকারি' করে বাঙ্গালির গর্বের বাংলাভাষার জাতিপুঞ্জের দ্বারা বিশ্বের মধুরতম ভাষার স্বীকৃতিকে একলহমায় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে এবং করোনাকালে লাল ইটের টুকরো দিয়ে সাদা দাগ কেটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটাকেও যে পদদলিত করে রাস্তার মাঝে নামিয়ে দিয়েছেন। ২০১১-তে ক্ষমতায় এসে যে মহারথীদের দিয়ে অন্য দল ভাঙিয়ে নেতাদের নিয়ে এসে বিরোধীশূন্য করতে চেয়েছিলেন ২০২০-তে সেই মহারথীরাই শাসকদলকে ভেঙে চুরমার করছে এবং যা পূর্ণতা পাবে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে। আজ দলত্যাগীদের বিশ্বাসঘাতক বলে একপ্রকার পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের বিশ্বাসঘাতকরূপে দেগে দিতেও একবারের জন্য কুণ্ঠিত বোধ করেননি। বামেদের অপশাসন থেকে যে ভোটাররা আপনাকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসালো সেই ভোটাররা যেই ২০১৯ লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি-কে ১৮ সিট উপহার দিল তখনই দলত্যাগীদের বিশ্বাসঘাতক বলে বকলমে ভোটারদেরই বিশ্বাসঘাতক বলে দেগে দিলেন। অথচ কংগ্রেসকে ভেঙে যখন নতুন দল তৈরি করলেন তখন কিন্তু নিজেকে একবারের জন্যও বিশ্বাসঘাতক বলে ভাবেননি! এমনকী যে বিজেপির হাত ধরে টলমল পায়ে হাঁটতে শিখলেন এখন সেই বিজেপিকেই এখান থেকে মুছে ফেলতে চাইছেন। এটাও বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর! তাই এর থেকে সত্যিই প্রমাণিত হয়, আপনি আমাদের গর্বই বটে! সেইজন্যই হিন্দু বাঙ্গালিরা আপনাকে অনুসরণ না করে অনুকরণ করে ফেলছে! এতে দোষ কোথায়? যতই হোক আপনি বাংলার গর্ব বলে কথা!

—সৌমজিৎ মাইতি,
তারকেশ্বর, হুগলী।

বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কিছু কথা

প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় যদি একই হয় তাহলে উপভোক্তার নিকট হতে বিভিন্ন স্তম্ভে বিদ্যুতের মূল্য পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করার কারণটা বোধগম্য নয়। যদি উদ্দেশ্য হয়— বিদ্যুৎ খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা, তাহলে বলতে হয় বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যেখানে সরকারের বক্তব্য 'বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হচ্ছে'। যদি বলা হয় প্রধানত কয়লা জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়— কয়লা সাশ্রয় এবং প্রদুষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ব্যবস্থা, তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রথম স্তম্ভের পরে বর্ধিত হারে বিদ্যুতের মূল্য উপভোক্তার নিকট হতে আদায় করা হয় তাতো বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থার প্রাপ্য নয়। সেটা রেভিনিউ আকারে সরকারের প্রাপ্য হওয়া উচিত এবং আদায়িকৃত ধনরাশি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় হওয়া উচিত নয় কি? একজন নাগরিক হিসেবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন রইল।

—তপন কুমার বৈদ্য,
দমদম, কলকাতা-৭৪।

একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন দাওয়াই

মজার কথা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মিছিলে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল 'দেশকে গদ্দারকো গোলি মারো গোলি মারো।' এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন দেশের কিছু রাজনীতিক। কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার কারণটা কী? 'দেশকে গদ্দারকো গোলি মারো' কথার অর্থ দেশের শত্রুকে শেষ করে দাও। এটাতো সঠিক। তাহলে? আসলে কিছু রাজনৈতিক দল এই গদ্দারদের নিজেদের দলে পেতে চাইছে। তারপর তাদের সহায়তায় রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে। মজার কথা, পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল থেকে ওই স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু পরেরদিন বিজেপির মিছিল থেকে যখন ওই স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তখন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে আর ওই স্লোগান দেওয়ার অপরাধে কয়েকজনকে কারারুদ্ধ করে। অহো কী রাজ্যে আমাদের বাস! পরে অবশ্য শাসকদল থেকে কৈফিয়ত দেওয়া হয়েছে দোষীদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাঃ, কী রাজ্যে আমাদের বাস! বাঃ, কী সুন্দর! একদলের জন্য কারাবাস, অন্যদের জন্য দল থেকে বহিষ্কার। একটি মজার ব্যাপার ঘটে গেল সম্প্রতি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার জন্য সভামঞ্চে উপস্থিত হতেই শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে থাকে। তারা জানত 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কিছুদিন আগে ভাটপাড়ায় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে স্লোগানকারীদের দিকে তেড়ে যান। নেতাজী জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় জয় 'শ্রীরাম ধ্বনি' শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখা থেকে বিরত রইলেন। মজার ব্যাপার নয় কি?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

জাগরণে ভয়ং নাস্তি

কথায় বলে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। সত্য, সুন্দর, সুনীতি ও সুশাসনের জন্য যাঁরা বিক্রম ও শক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁদের 'বীর' বলি। পেশীশক্তির মদতপুষ্ট ভয়ংকর দুর্নীতির সমর্থক কখনও বীর হতে পারে না। তাদের পুরো শক্তিটাই অশুভ ও আসুরিক। তারা রসাতলের দুরাত্মা। তাই বীরবাহু ও সুমনের কাছে রাজ্যপাট যাওয়ার প্রতীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ। ২০২১-এর নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল ঘটানোর জন্য প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের সবচাইতে বড়ো যে দায়িত্ব নিতে হবে, তা হলো 'বুথ আগলানো'র কাজ। শক্তি-সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, 'জাগা ঘরে চুরি নেই।' গ্রাম বাঙ্গলার একটি জনপ্রিয় প্রবাদও হলো, 'জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা/নিদ্রায় লক্ষ্মী হন বিরূপা।' প্রচার যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে হবে না। জয় এসে গেছে, এমন নিশ্চিন্ত ভাব আসাটা ভোটযুদ্ধে ভালো লক্ষণ নয়। ভোট লুটের অসভ্য রাজনীতি যাতে রাজ্যবাসী না দেখেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। জনগণ দু-হাত ভরে শুভশক্তিকে নজরানা দেবেন, তা লুঠ করে নেবে পেশীশক্তি, এটা কখনোই মেনে নেবে না তারা। অর্থাৎ চোখে চোখ রেখে টানটান হয়ে বুথ আলগাতে পারলেই পালাবদলের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে। প্রতিটি বুথে তাই লড়াকু বীরের সজাগ উপস্থিতি থাকা চাই। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' বললে চলবে না।

এখন বুথ কীভাবে রক্ষা করতে হবে? কীভাবে ভোট লুঠ রুখবেন সম্ভাবনার রাজনৈতিক কর্মী ও পোলিং এজেন্টরা। এ বিষয়ে সবচাইতে বড়ো ভরসার স্থল হচ্ছে 'স্বামী বিবেকানন্দ'। স্বামীজীর পুরো জীবন সাধনাই ছিল শক্তিমান হবার লক্ষ্যে। তাঁর কথা, পৃথিবী একটি বৃহৎ জিমনেসিয়াম, এখানে আমরা শক্তি সঞ্চার করতেই আসি। তিনি যখন সমগ্র ভারতবর্ষ পরিব্রজন করছেন, একস্থানে প্রাচীরের কাছে একটি বানর খেঁচিয়ে তেড়ে এলো তাঁকে। স্বামীজী প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন তখন ভীরু-কাপুরুষের মতো। পিছনে এক সাধু এই অবস্থা দেখে স্বামীজীকে ধমকের সুরে বললেন, 'সামনা করতে শেখো'। স্বামীজী এবার হঠাৎ ঘুরে রুখে দাঁড়ালেন, প্রবল আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে গেলেন বানরের দিকে। বানর দ্রুত পশ্চাদপসরণ করলো।

২০২১-এর প্রতিটি বুথে ভোট লুঠেরাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদী শক্তির সেবক ও কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের মধ্যে পূর্ব থেকেই এ ব্যাপারে বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিন। এখন থেকেই রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মী ও কার্যকর্তারা সকালে নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। তাড়াতে হবে আমাদের যাবতীয় অলসতা, সকল অকর্মণ্যতা। শরীর ও মনকে সতেজ রাখতে হবে, জীবনকে গতিময় ছন্দে আনতে শরীরচর্চা নিয়মিত করতে হবে। দলীয় সমর্থকদেরও শরীরচর্চা করার উপদেশ দিন। এতে তাদেরও মনোবল বাড়বে। মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তার বলীয়ান করে তুলুন সম্পর্কে আসা সকল মানুষকে। এরাই আপনার বুথে ভোটচুরি রুখবেন। সকলে একসঙ্গে থাকার বার্তা দিন, এটা সবচাইতে বড়ো শক্তি, এটাই অব্যর্থ মহৌষধ। শক্তির উপাসনা না থাকলে, এই লড়াইয়ে জেতা যাবে না। আমাদের পিছিয়ে পড়া আচরণের কারণ, আমাদের যাবতীয় পশ্চাৎপদতার কারণ হলো, আমরা শারীরিকভাবে দুর্বল। স্বামীজী বলতেন, শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা যে একসঙ্গে মিলতে পারি না, পরস্পরকে ভালোবাসি না, তোতাপাখির মতো কথা বলি, তার কারণও আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা। তাই সবল হবার যাবতীয় উদ্যোগ নিন, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ভরসা। সব কাজে ছাকনি বা নেহ্রুন থাকা চাই। কার উপর ভরসা করা যায়, কে 'কোজাগরী রাত' অর্থাৎ বুথ পাহারা দিয়ে রাজ্যে সুশ্রী শক্তি এবং লক্ষ্মীর আসন পাতার সংকল্প করবেন, তাদের চিহ্নিত করুন। তাদের নিত্য শক্তি বৃদ্ধি করুন। গীতা অনুধ্যান করে পাই শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ শক্তি প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় এবং সেটাই ন্যায়।

—কল্যাণ গৌতম,
কল্যাণী, নদীয়া।

সংসার সুখের করতে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন

সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে একঘেয়েমি কাটাতে বিভিন্ন রকমের কাজ করে থাকি। বিশেষত ঝগড়া হলে, মন কষাকষি হলে, আমরা প্রায়ই ভাবি এ সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাব। ডিভোর্স পাওয়াটা আজকাল জলভাত। সংসার ভেঙে বেরিয়ে যাওয়াটাও তেমন কোনও বড়ো ব্যাপার নয়। কথায় বলে— ভাঙা সহজ, গড়া জিনিসকে ধরে রাখা কঠিন।

অনেক সময়ে আমরা ভেবে নিই, কোনো দম্পতির জীবনে একটি সন্তান এলে সেই দম্পতি একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারবে না। সত্যি কি তাই? সন্তানসুখ সবাই চায়। কিন্তু সন্তান কি একটি ভাঙা সংসারকে জোড়া লাগাতে পারে? তারই কিছু নমুনা রাখছি।

আমাদের ভারতীয় সমাজ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষেরা ভাবে 'বিয়ে' এমন এক সমস্যার সমাধান, যা সব কিছু ঠিক করে দেয়। ছেলে বখে যাচ্ছে তো সংসারে বেঁধে ফেলো, দেখবে আপনা থেকেই সংসারী হয়ে উঠবে। মেয়েটা যে কী করছে, অফিস থেকে রাত করে বাড়ি ফিরছে বা সারাদিন মোবাইলে থাকে— কী যে করে তা বোঝা মুশকিল। এবার বিয়ে দিয়ে দাও। এই হলো প্রাথমিক মানসিকতা। যার থেকে আমরা কিন্তু আজও বেরিয়ে আসতে পারিনি। এরপর ধরে নিন, এই রকম দুটি ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সমস্যার সমাধান হলো কিছু? এক কথায় না। এরপরও যখন সমস্যার সমাধান হয় না তখন উপায় হলো, 'একটা বাচ্চা আসুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।' এটা কি সত্যি? এতে সমাধান কি আদৌ হয়?

এক ছাদের তলায় স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে থাকতে গেলে অনেক ধৈর্য রাখতে হয়। মনের মিল নাও হতে পারে, আর্থিক সমস্যা থাকতে পারে, আবার পারিবারিক কোনও সমস্যাও থাকতে পারে— এসব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই চলতে হবে। তবেই একটা সংসার না ভেঙেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

সাংসারিক অশান্তি যখন তুঙ্গে, তখন মহিলাদের প্রায়ই শোনানো হয়, 'একটা বাচ্চা হোক সব ঠিক হয়ে যাবে'। বিষয়টা এত সহজ নয়। বিবাহিত জীবনে বহু রকমের সমস্যা হয়। তার জন্য একটি বাচ্চা হলেই সেই সমস্যার সমাধান হবে, এটা ভাবা একেবারেই ঠিক নয়। সন্তান জন্মানোটা কোনও সমাধান নয়। সমস্যা তাতে বেড়ে যাবে, এমনটাও বলছি না।

একটি সন্তান এলে দম্পতির গোটা লাইফ সাইকেলটাই বদলে যাবে। সংসারে খরচ অনেক বাড়বে। বাচ্চা যত বড়ো হবে তার টিকাকরণ, তার মেডিক্যাল, তার ফুড-প্রোটিন— এসব কারণে স্বাভাবিক ভাবেই খরচা বাড়বে। হামেশাই ছোটো বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তখন তার দেখভালের জন্য নিশ্চয়ই আপনি আয়ার ওপরই শুধু নির্ভর করবেন না। এটা বলাই বাহুল্য যে, এসব ক্ষেত্রে মায়েদের বেশি করে সামাল দিতে হয়। আর তিনি যদি ওয়ার্কিং মা হন তাহলে তো তার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। ফলে দম্পতির মধ্যে হামেশাই খিটখিটে সম্পর্ক হয়ে যায়।

সমীক্ষা বলছে, একটি বাচ্চা আসার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কে অনেকটাই দূরত্ব তৈরি হয়। এটা খুব একটা ভালো দিক নয়। অথচ আপনি বা আপনার স্বামীর কিছুই করার থাকে না। এই পরিস্থিতি অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। ফলে এই দূরত্ব বাড়তেই থাকে। তখনই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটে। সুতরাং সাবধান। যতই ট্রেস থাকুক না কেন, আপনাকে সংসারের সব দিকটাকে চালনা করতে হবে। স্ট্রেস তো আসবেই, তাকে হ্যান্ডেলও করতে হবে।

আপনার স্বামীকে কিছু কিছু দায়িত্বও নিতে শেখান। যেমন ডায়পার পাল্টানো, বোতলে দুধ তৈরি করা, মাঝে মাঝে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘোরানো ইত্যাদি। এটা মনে রাখবেন, বেশিরভাগ পুরুষ এটা করতে চাইবে না। তাকে নিতে শেখানো দায়িত্ব আপনারই। এর জন্য অসীম ধৈর্য প্রয়োজন।

আবার অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সত্যি যে, সন্তান সংসারে আসার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ডিং আরও বাড়ে। মনোমালিন্য একবারে চলে যায়, বোঝাপড়াও মজবুত হতে থাকে। এমনও দেখা গেছে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সমান দায়িত্ব নিয়ে সন্তান পালন করছেন। তবে এটা ব্যতিক্রম। সমস্যাটা হবেই এটা ধরে নিয়ে এগনোই ভালো।

আসলে একটা ছোট্ট ফুলের মতো শিশু অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয়। অনেক অপমানের জ্বালা, না পাওয়ার কষ্ট—সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়। আপনার জন্য কী ভবিতব্য আছে, সেটাই এখন দেখার। তবে ধৈর্যের থেকে বড়ো ওষুধ আর কিছুই নেই। ■

পক্ষাঘাতের পর সুস্বাস্থ্যের জন্য ফিজিওথেরাপি ও ব্যায়াম জরুরি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

পক্ষাঘাত হয়েছে শুনলে সাধারণভাবেই পরিবারের লোকজন ভীত হয়ে পড়েন, ভাবেন এবারে বোধহয় রোগী সারাজীবনের জন্য অসুস্থ বা পঙ্গু হয়ে থাকবেন। আসলে এই স্ট্রোক বা পক্ষাঘাত থেকে শরীরের কোনও কোনও অংশের মাংসপেশি অনেকটাই দুর্বল হয়ে যায়। ফলে রোগীর শরীরের স্বাভাবিক ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটে। যার ফলে নিত্যদিনের কাজকর্ম একা একা করতে রোগীর অসুবিধা হয়। সেজন্যই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে রোগীকে ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপি করে যেতে হবে।

পক্ষাঘাতের পরে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা :

পক্ষাঘাতের রোগীদের অবস্থা কতটা উন্নত হবে, তা নির্ভর করে ব্যায়ামের উপর। যত দ্রুত ফিজিওথেরাপি ও নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম শুরু হবে, তত দ্রুতই রোগীর উন্নতি হবে। তবে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ফিজিওথেরাপি নেওয়া ও ব্যায়াম করা দরকার। তাছাড়া ব্যায়ামের কার্যকারিতা নির্ভর করে রোগীর পেশি কতটা দুর্বল তার উপর। ক্রমাগত এই ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপি চালিয়ে গেলে রোগী নিজের প্রাত্যহিক কাজকর্ম (যেমন বসা, দাঁড়ানো, লেখা, স্নান করা) অনেকটাই ধীরে ধীরে করতে পারেন। তবে সবক্ষেত্রেই যে একশো শতাংশে সেরে যাবে এমনটা বলা যায় না। কারও কারও ক্ষেত্রে পক্ষাঘাতের ফলে মুখ বেঁকে যায়, কারও-বা কথা বলতে ও খেতে অসুবিধা হয়, কেউবা ঘুমের সময়ে পুরো চোখ বন্ধ করতে পারেন না। তাছাড়া ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপির ফলাফল পেতে অনেকটা সময় ব্যয় হয়।

কী করতে হবে ফিজিওথেরাপি ও ব্যায়ামের ক্ষেত্রে :

স্ট্রোকের রোগীদের ফিজিওথেরাপি করতে হবে কি না তা চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার। ফিজিওথেরাপি সেন্টারে গিয়ে ফিজিওথেরাপি করানো যেতে পারে আর রোগী যদি একেবারেই চলাফেরা করতে না পারেন, তাহলে বাড়িতে কোনও বিশেষজ্ঞকে ডেকে ফিজিওথেরাপি করাতে পারে। তবে খেয়াল রাখা দরকার ফিজিওথেরাপির সময়ে রোগীকে বেশি টানাহ্যাঁচড়া করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টকে দিয়ে কাজটি করানো হলেও ধীরে ধীরে বাড়ির লোককেও সেটা শিখতে হবে। যদি মস্তিষ্কে রক্তপাত হয়ে স্ট্রোক হয়, তার ফলে রোগী পক্ষপাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে পরেই ফিজিওথেরাপি করাবেন না। কারণ এতে আবারও মস্তিষ্কের ভেতরে মৃদু রক্তপাত হাতে পারে, সেক্ষেত্রে কখন ফিজিওথেরাপি শুরু করতে হবে, তা চিকিৎসকরাই বলে দেবেন।

না করলে কী কী সমস্যা :

আসলে পক্ষপাতগ্রস্ত রোগীকে ঠিকমতো সারিয়ে তুলতে ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপি দুটোরই একসঙ্গে প্রয়োজন আছে। না হলে রোগীর পেশি যেমনকার তেমনি দুর্বল থেকে যায়। বিছানা থেকে উঠতে রোগীর কষ্ট হয়, হাঁটা বা দাঁড়াতেও খুব সমস্যা হয়। এর ফলে নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম ঠিকমতো করতে না পারায় রোগী মানসিক দিক থেকেও অনেকটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি বাড়ির লোকের সমর্থনও ভীষণ দরকার যাতে রোগী মনে না করে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই পেশির শক্তি এতটাই কমে যায় যে খাদ্যনালী ও জিহ্বা ইত্যাদি আক্রান্ত হওয়ার ফলে নাকে নল ঢুকিয়ে খাওয়াতে হয়। মুখমণ্ডলের পেশি দুর্বল হয়ে গেলে কথা জড়িয়ে যায়। চোখ যদি শোওয়ার সময়ে ঠিকমতো না বন্ধ হয়, তার থেকে সংক্রমণের সমস্যা হয়। সেজন্যেই নির্দিষ্ট ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপি প্রয়োজন।

সাধারণভাবে রোগীদের যেসব পেশি দুর্বল হয়ে গেছে বা যে পাশটা দুর্বল রোগী তা কম ব্যবহার করতে চান, ফলে এই দুর্বল পেশির আকার ছোটো হয়ে আসে, কুঁচকে যায় ও শক্ত হয়ে যায়। অবশ অংশে সংক্রমণ, ঘা, বেডসোর, রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার মতো জটিলতা হতে পারে। পক্ষাঘাত হলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও ফলপ্রসূ। ▫

মুসলমান ভোটারদের প্রভাবিত করতে একই মঞ্চে ধর্মীয় নেতা তথা সিদ্দিকির সঙ্গে মমতা ব্যানার্জি। (ফাইল চিত্র)

বঙ্গীয় রাজনীতিতে মেরুকরণের জন্য দায়ী তৃণমূল

সুজিত রায়

'৮০ কিংবা '৯০-এর দশকেও যখন গোটা উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারতের অর্ধাংশ এবং বিহারে ভোটের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত হীন জাতপাত প্রথার জঘন্যতম রুচি, যখন জায়গায় জায়গায় বিশেষত মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে বিশেষভাবে 'লালনপালন' করা হতো শুধুমাত্র ভোটের লগ্নে, সেই সব গণতান্ত্রিক দুঃসময়েও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে তেমনভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ প্রচেষ্টা প্রশ্রয় পায়নি— একথা ইতিহাসবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিকরা সকলেই স্বীকার করেন। তার মানে অবশ্য এমন নয় যে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয়নি। হয়েছে। বরাবরই হয়েছে। সেই স্বাধীনতা-প্রাপ্তি এবং ভারত বিভাজন ও বঙ্গ-বিভাজনের আগে থেকেই। কিন্তু তেমনভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের ঘটনা ঘটেনি। যা কিছু ছিল সবই ছিল অস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন।

কিন্তু গত পাঁচ বছরে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছে। এ রাজ্যের সংস্কৃতি এবং পরম্পরার সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তুলে অসাম্প্রদায়িকতার যে গর্ব এবং অহং-এর আমেজ ছিল রাজনৈতিক পরিবেশে তা ধুয়ে

এনআরসি, সিএএ-র বিরোধিতার নামে কয়েকদিন ধরে চলল রাজ্যজুড়ে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব ও অগ্নি সংযোগ। নষ্ট করা হলো কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে এর প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। (ফাইল চিত্র)

এনআরসি নিয়ে কেন্দ্র বিরোধিতার নামে সংখ্যালঘুদের উস্কানি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। (ফাইল চিত্র)

মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। ধর্মান্ধতা ও মেরুকরণের রাজনীতির বিপরীতে অবস্থানরত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অসাম্প্রদায়িক গণচেতনা আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভূলুণ্ঠিত এবং একথা প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়েছে যে ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হবে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতেই।

কেন এই পরিবর্তন?

পিছিয়ে যেতে হবে অনেকগুলি বছর। কলকাতার কসবার বিজন সেতুতে ১৯৮২ সালে ১৭ জন আনন্দমার্গী প্রচারককে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল রাজ্যের প্রধান বামশক্তি সিপিআই (এম)। রাজ্যে তখন বাম জমানা। প্রশাসন বামেদের হাতে। এতবড়ো অপরাধের কোনো শাস্তি হয়নি। সুরাহা হয়নি।

কেন ঘটেছিল এ ঘটনা?

ঘটেছিল বললে ভুল হবে। ঘটানো হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবেই। কারণ রাজ্যের বাম প্রশাসন চায়নি, অনেক কসরত করে, অনেক কৌশল করে অন্যান্য সমস্ত বাম রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে মধুর লোভ দেখিয়ে চাকরবাকরে রূপান্তরিত করার পর এ রাজ্যে সিপিআই (এম) ছাড়া আর কোনো শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক। আনন্দমার্গীদের সেজন্য টার্গেট বানানোর পশ্চাদপট ছিল একটাই— আনন্দমার্গীরা বেড়ে উঠছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং সমস্ত অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মাটিতে আরও একবার সন্ন্যাস বিদ্রোহের আভাসকে স্পষ্ট করে তুলছিল। বামপন্থীরা চায়নি, পশ্চিমবঙ্গে কোনও সমান্তরাল শক্তি শিকড় ছড়াক, যে শক্তির মূল উৎস ভারতীয়ত্ব তথা হিন্দুত্ব। কারণ বামশক্তি চিরকালই হয় চীন নয়তো রাশিয়া নির্ভর পরগাছা রাজনৈতিক শক্তি। রাষ্ট্রীয়তায় তারা বিশ্বাসী নয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত আগেই কলকাতায় ১৯৪৬-এর নরসংহারে প্রত্যক্ষভাবে মদত ছিল সোহরাবর্দির নেতৃত্বাধীন ইসলামিক শক্তির, যে সোহরাবর্দি আবার মহাত্মা গান্ধীর স্নেহধন্য আপনজন ছিলেন। তখন থেকেই এ রাজ্যের গান্ধীবাদী কংগ্রেসিরা সরাসরি ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি না করলেও মুসলমান তোষণের রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, কেউ কেউ বলেন, কংগ্রেসকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছিল হিন্দু মহাসভা, পরে জনসঙ্ঘ। তাদের মতে সংখ্যাগুরু তাস খেলা শুরু হয়েছিল জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। তাঁরাও নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন, শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো, বাঙ্গালিকে বাঁচানো, জেহাদি মৌলবাদের হাত থেকে বঙ্গসংস্কৃতিকে রক্ষা করা। একজন ভারতীয় রাষ্ট্রবাদী এবং একজন বাঙ্গালি হিসেবে এই উগ্রবাদ বিরোধী পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রসার ঘটানো কখনই ছিল না। তাই যদি হতো, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা আদৌ কোনওদিন ক্ষমতায় আসতে পারত না। আর সেই ক্ষমতাকে অটুট রাখতে বামপন্থীরাও কংগ্রেসের পথই অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ সেই সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি। জনসঙ্ঘ থেকে ততদিনে রূপান্তরিত বিজেপি কিন্তু তখনও এ রাজ্যে ছিল অস্তিত্বহীন।

ধর্মীয় নিরপেক্ষতার তাবিজ গলায় ঝুলিয়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব ভোটের লোভে সংখ্যালঘু তোষণের পথে হেঁটে ধর্মীয় মেরুকরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তারাই আজ মেরুকরণের জন্য বিজেপির দিকে আঙুল তুলছে। তাদের একটাই ভয়, মেরুকরণের রাজনীতি আজ ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে উঠবে না তো!

কিন্তু ২০০৯-১০-এর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে নয়া অবতার হয়ে ক্ষমতায় এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগ তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জন্ম দিলেন এক নতুন সংস্কৃতি— তা হলো, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে নির্লজ্জের মতো মুসলমান তোষণের পথে হেঁটে ভোটব্যাঙ্ককে মজবুত করে তোলা।

পশ্চিমবঙ্গের 'ধর্মনিরপেক্ষ' মাটিতে এখান থেকেই শুরু নির্লজ্জ ধর্মীয় রাজনীতির উন্মত্ত প্রকাশ আর এরপর পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিজেপির সামান্যতম উন্মেষ ঘটার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি। এর দায় কার?

বহু রাজনৈতিক বিশ্লেষক নিতান্তই 'সব শেয়ালের এক রা' তত্ত্বে গা গুলিয়ে বলে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ হয়েছে বিজেপি-র উন্মেষের পর থেকেই। কিন্তু যে সত্যটা তারা নির্বিবাদে কম্বলচাপা দিয়ে যান, তা হলো— বিজেপি যদি

তোষণ বন্ধ না হলে আবার দেশভাগ

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণের জন্য সিপিএম এবং টিএমসি-র মুসলমান তোষণ দায়ী। কারণ সিপিএমের শাসনকালে ৩৪ বছর ধরে মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখা হয়েছিল। গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ হলে গ্রামের প্রধান বা বিচারক মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে রায় প্রদান করতো। তাতে হিন্দু ভাই-বোনেরা ন্যায় পেত না। তাছাড়া পুলিশি সন্ত্রাস হিন্দুদের উপর হতো। মাটি কাটার খয়রাতি— সব কিছুতে মুসলমানদের প্রাধান্য দেওয়া হতো।

একই ভাবে টিএমসি বর্তমানে সিপিএমের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। ইসলামিক হসপিটাল, মাদ্রাসা, ইমামভাতা, মুসলমান ছেলে-মেয়েদের সাইকেল বিতরণ সব কিছুতেই তোষণ বিদ্যমান। যার ফলে হিন্দুসমাজ এই রাজ্যে এক ভয়াবহ সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই আজকে হিন্দুরা বাধ্য হয়ে বিজেপির ছত্রছায়ায় এসেছে। এর মধ্যে আবার আব্বাস সিদ্দিকির দল, ওয়েসির মিম পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনৈতিক মেরুকরণ অনিবার্য করে তুলেছে।

বিজেপি বাদে সব রাজনৈতিক দল ভোটের স্বার্থে মুসলমান তোষণ করে চলছে। এটা বন্ধ হওয়া জরুরি। তা না হলে আবার একটি দেশভাগের পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই বিপজ্জনক তোষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। দেশভাগের করুণ পরিণতি আমরা আজও ভুলতে পারিনি।

কিছু স্বার্থপর ধর্মান্ধ মুসলমান কংগ্রেস, সিপিএম, টিএমসির প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়েছে। দেশ-বিরোধী কার্যকলাপ করছে। যার ফল ভুগতে হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমী মুসলমানদের।

(আলী হোসেন, বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি)

হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের মেরুকরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিগুলি এতদিন ধরে যে সক্ষমতা দেখিয়ে এসেছে তা হলো, সংখ্যালঘু ভোটের মেরুকরণ প্রচেষ্টা। তাই যদি নাই হতো, তাহলে হিন্দু ভোটাররা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূলিদের 'নিশ্চিন্ত আশ্রয়' ছেড়ে বিজেপির পাখনার তলায় আশ্রয় নিল কেন?

বিজেপি কোনোদিন অস্বীকার করেনি— ভারতীয়ত্ব তাদের আদর্শ। আর সেই ভারতীয়ত্বের মূলে রয়েছে হিন্দুত্ব। হিন্দুত্ব কোনও ধর্মবাদ নয়। হিন্দুত্ব একটা কনসেপ্ট, একটা চিন্তাধারা, যা হলো সর্ব ধর্ম সমন্বয়, মানবতা, উন্নয়ন, প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের প্রয়াগস্থল। বিরোধীদের মস্তিষ্কে মিথ্যা এবং ভুল ন্যারেটিভ খেলা করে বলেই তারা ধরে নেয়, হিন্দু মানেই মুসলমান বিরোধী, খ্রিশ্চান বিরোধী, দলিত বিরোধী। ফলত, রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার চাদর জড়িয়ে গোমাংস ভক্ষণ করে প্রমাণ করতে হয়, তারা আসলে হিন্দু হয়েও হিন্দুত্ব বিরোধী। হিজাব পরে রোজা ভঙ্গের জমাটি মোগলাই খানার ভোজে গিয়ে আল্লার দোয়া মাঙ্গতে হয় মুসলমানদের নকলনবীশ করে। আর পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে কুমিরের কান্না কেঁদে, আর্থিক অনুদান দিয়ে দিন দিন ভিখারিতে পরিণত করা হয় মুসলমান সমাজকে, বনবাসী আর দলিত সমাজকে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতালোভী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সংখ্যালঘু আদিখ্যেতার রাজনীতি করতে গিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটিয়ে ফেলেছেন নিজের অজান্তেই এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবারই প্রথম ভোটবাক্স ভাগ হতে চলেছে নির্মমভাবে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর অধুনালুপ্ত যৌথ পরিবারের মাঝখানে দেওয়াল তুলে।

২০১১ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভৈরব বাহিনী গোটা পশ্চিমবঙ্গকে 'পৈতৃক সম্পত্তি' ভেবে নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ফণা তুলতে না দেওয়ার মনোবৃত্তি নিয়ে চরম ফ্যাসিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। প্রাথমিক আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বামপন্থীরা। সেই সঙ্গে মাওবাদীরাও, যাদের ঘাড়ে চেপে ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। ২০১৬-র পর থেকে সেই আক্রমণের অভিমুখ পরিবর্তন হয়। এক এবং একমাত্র শত্রু হয়ে ওঠে বিজেপি। তৃণমূলের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্ভরশীলতার চরম প্রকাশ ঘটে ২০১৯ সালে যখন কেন্দ্রের এনডিএ সরকার নাগরিকত্ব আইন পাশ করে। সরকারি এবং শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়ে যায় মৌলবাদী জেহাদি শক্তির নৃশংস আক্রমণ। টানা তিনদিন ধরে তাণ্ডব চললেও সরকার নিশ্চুপ ছিল। বামপন্থীরাও এই তাণ্ডবে প্রকাশ্য বিরোধিতা করেনি। কারণ নাগরিকত্ব আইন বামপন্থীদের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতিতেও যে বিশাল আঘাত হানবে সেটা তারা বুঝে নিয়েছিল।

ফলত, প্রমাণ হয়ে গেল তখনই— এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীরা ভোট চান ধর্মের ভিত্তিতে, উন্নয়ন অনুন্নয়নের প্রশ্নে নয়। লাভ হলো, বিজেপিরই। তৃণমূল সুপ্রিমোর চরম

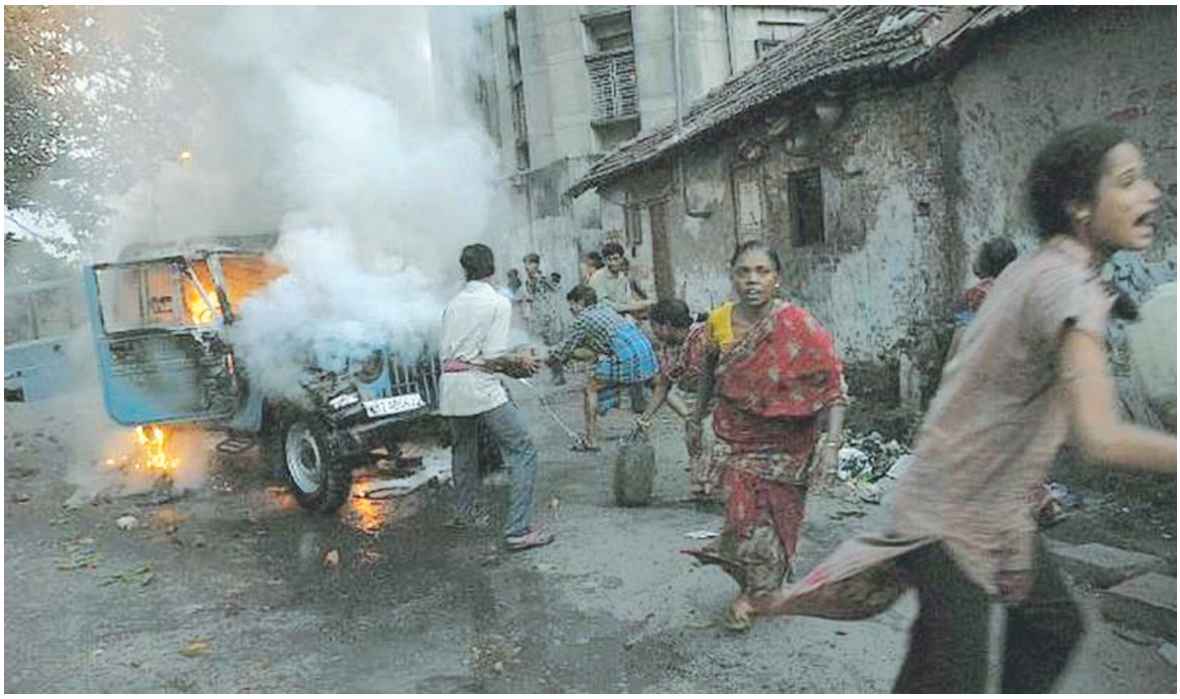

বাম আমলেও একই দৃশ্য— তসলিমা বিরোধিতায় কলকাতার পার্ক সার্কাসে অবাধে চলল ভাঙচুর, পুলিশের গাড়িতে আগুন দেওয়া। সংখ্যালঘু ভোটের ভয়ে মুখে কুলুপ। (ফাইল চিত্র)

বদমেজাজি, বুদ্ধিহীন কায়েমি রাজনৈতিক চিন্তাধারা হিন্দু ভোটারদের অনেক বেশি মাত্রায় সংগঠিত করে তুলল। আর তার ফল হলো কী? রাজনীতি নির্বিশেষে সাধারণ ভোটাররাও তৃণমূল বিরোধী হয়ে গেল। গোটা রাজ্য জুড়ে প্রায় চোখের নিমেষে গেরুয়া ঝড় উঠে গেল। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি হাসতে হাসতে বিপুল ভোটে জিতে নিল ১৮টি আসন। অর্থাৎ কম-বেশি ১২৫টি বিধানসভা কেন্দ্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজার চেষ্টা করেও, ব্রিগেডে গোটা ভারতের অধিকাংশ বিজেপি বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করেও গেরুয়া ঝড়ের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসকে রুখে দিতে, বিজেপি-বিরোধী জোট গড়তে হাস্যকর ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ একটাই— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিচার মানি তবে তালগাছটি আমার' মনোভাব। আসলে সব দলই বুঝে গিয়েছিল— মমতার জোট তৈরির মূল লক্ষ্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। প্রচারও শুরু হয়ে গিয়েছিল জোর কদমে। কিন্তু আখেরে বিজেপি বিরোধী ভোট বিভক্তির সুযোগে বিজেপির পাল্লাই ভারী হয়েছে গোটা দেশে। ২০১৯-এর লোকসভার ফলাফলই তার প্রমাণ।

সবচেয়ে বড়ো আঘাতটি অবশ্য এসেছে মুসলমানদের তরফ থেকেই। ইমাম ভাতা, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপে ভরিয়ে দেওয়া— ইত্যাদি পদক্ষেপগুলিকে মুসলমান সমাজই ভালোভাবে নেয়নি। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সব প্রকল্পগুলিকে তাঁরা 'ফাঁদ' বলে মেনে নিয়ে উন্নয়নের প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন— মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষা কোথায়? চাকরি কোথায়? ব্যবসার সুযোগ কোথায়? সাংস্কৃতিক উন্নয়নের রাস্তা কী? ফলত এ রাজ্যের মুসলমান জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়ে নয়া সংখ্যালঘু মসিহা আব্বাস সিদ্দিকী ওয়েইসি-র মিমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছোটো বড়ো নানা আঞ্চলিক শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছেন ধর্মনিরপেক্ষ জোট।

এ জোট আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এ জোট মূলত তৃণমূলের একচেটিয়া ক্ষমতায়ণের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়ার জন্য মেরুকরণ করার একটা প্রচেষ্টা। এই ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্টের সঙ্গে বামপন্থীরাও নির্দ্বিধায় হাত মিলিয়েছে। কারণ তাদের হালে এখন পানি নেই। হালভাঙা নৌকার মাঝির মতো দিশাহারা সিপিএম এবার ভোটে এই সংখ্যালঘু জোটের শরিক হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দুভোট তাই আরও বেশিমাত্রায় সংগঠিত হয়েছে। পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত যে অবস্থায় রয়েছে— তাতে নিশ্চিত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার একূল ওকূল— দু-কূলেই নৌকা ভেড়াতে ব্যর্থ হবেন। তাই সামাল দিতে তিনি এখন পুরোহিত ভাতা চালু করেছেন। মঞ্চে মঞ্চে মুখস্থ করা কিছু সংস্কৃত স্তোত্র আউড়ে হিন্দুদের মন জয় করতে চাইছেন।

কিন্তু রাজ্যের মানুষ আর ছলচাতুরিতে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। তাঁরা বুঝে গেছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ বিজেপি ঘটায়নি। ঘটিয়েছে তৃণমূলই। আর তৃণমূলের সেই আগ্রাসী রাজনীতির ফাঁক দিয়েই ছড়িয়ে পড়েছে বিজেপির রাষ্ট্রবাদী, মানবতাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ। ফলে বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন বাড়ছে অঞ্চলভিত্তিক গেরুয়া শিবির। দলে দলে মানুষ নাম লেখাচ্ছে বিজেপিতে। প্রতিদিন মালদা মুর্শিদাবাদের গঙ্গার পাড়ের মতো ভাঙছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বাঙ্গলার রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাস তাই বলার অপেক্ষা রাখে না— এ রাজ্যে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার তাবিজ গলায় ঝুলিয়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব সংখ্যালঘু তোষণের পথে হেঁটে ধর্মীয় মেরুকরণের পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য বিজেপির কোনও দায় নেই। কারণ এরাজ্যে বিজেপি প্রায় সদ্য প্রস্ফুটিত একটি পদ্মমাত্র। তার অনেক আগেই ঘাসফুলে ছেয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান নেত্রীর ফ্যাসিবাদী মনোভাব, আত্মম্ভরিতা, উগ্র মেজাজ, আকাশ ছোঁয়া দুর্নীতির পাশাপাশি চরম মেরুকরণের রাজনীতি আজ ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে উঠেছে। বুমেরাঙের মতো আঘাত হানতে প্রস্তুত সেই ভুল রাজনীতি। সান্ত্বনা একটাই— এ রাজ্যে বিজেপিকে সেই ঘৃণ্য রাজনীতি করতে হয়নি। ধর্মীয় মেরুকরণ থেকে অনেক দূরে থেকেও ২০২১-এ রাজ্যের শান্তি ফিরিয়ে আনতে অনেক কদম এগিয়ে গেছে বিজেপি। এ স্রোতকে রোখার সাধ্য কোনও রাজনৈতিক শক্তিরই নেই। ■

তৃণমূলের সঙ্গে মিমের গোপন আঁতাত হতে পারে

সুকল্প চৌধুরী

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটি অংশের মতে এবারের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে মিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সকলেই জানেন প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী এমনকী দেশ বিরোধী— তবে পাকিস্তান ও ভূমধ্য সাগরবর্তী কয়েকটি দেশের অনুরাগী ও মুখাপেক্ষী অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) যা মিম নামেই পরিচিত, একান্তই মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন। তারা এবারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নেবে। হায়দরাবাদে বসবাসকারী এবং সেখানকার সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসির পারিবারিক এই দলটি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা দিনারে পুষ্ট। ওয়াইসিকে আধুনিক জিন্না বলা হয়। মুসলিমদের উন্নতির নামে দেশ বিরোধী, দেশের সেনা বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী প্রচার ওয়াইসির দলের একমাত্র কাজ। প্রচুর সম্পদের অধিকারী এই দলের নেতা অনেকবারই সংসদে দেশ বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন। সদ্য সমাপ্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মিমের নেতারা বারবার মুসলমান ঐক্যের নামে দেশের বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। ২০১৭ সালের ২৩ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক ও নিকাহ হালাল বাতিলের রায় দানের পর ওয়াইসি ঘোষণা করেছিলেন, মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য পুলিশ সরিয়ে নিলে গোটা হিন্দুস্থান মুসলমানরা দখল করে নেবে।

কট্টর মৌলবাদী দল মিমের সর্বোচ্চ নেতা এই রাজ্যেও এবারের নির্বাচনে লড়াই করবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন। বিহারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের ইসলামপুর মহকুমার লাগোয়া কিষানগঞ্জ জেলার তিনটি আসনে সাফল্যের পর ওয়াইসি 'পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াইয়ের ডাক' দিয়েছেন। বিহারের কাটিহার, কিষানগঞ্জ, পূর্ণিয়া এলাকায় প্রথম থেকেই মুসলমান-অধ্যুষিত। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের পর এইসব এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের প্রভাব আরও বেড়েছে। প্রতিটি মহল্লায় রোজ গজিয়ে উঠছে ছোটো বড়ো মসজিদ ও খারিজি মাদ্রাসা। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে এইসব মসজিদ বা মাদ্রাসা থেকে কেবল ধর্মীয় উপসনা বা ইসলামিক শিক্ষা দেওয়া হয় না, পাশাপাশি হিন্দুবিরোধী, দেশবিরোধী প্রচার চালানো হয়। প্রকারান্তরে জঙ্গি মদত দেওয়া হয় বলেই মনে করেন গোয়েন্দারা। এই প্রেক্ষাপটে বিহারের এই সব জায়গাতে শক্ত ঘাঁটি গড়তে পেরেছে মিম। উত্তরপ্রদেশে মুলয়েম সিংহ যাদব, বিহারে লালুপ্রসাদ যাদব ও পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদতে এই তিন রাজ্যে ভারত তথা দেশবিরোধী মুসলমানদের রমরমা বেড়েছে। মুসলমান মাত্রেই দেশবিরোধী এমন কথা কেউ মনে করেন না। কিন্তু মুসলমান তোষণকারী মমতা, মুলায়েমদের মতো নেতা-নেত্রী অথবা কংগ্রেস বা এনসিপির মতো রাজনৈতিক দলগুলির মদতে ভারত বিরোধী শক্তি বাড়ছে সর্বত্র। এই রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, পার্সি-সহ অন্যান্যদের ইচ্ছাকৃত ভাবে

ফঃ ৪

উপেক্ষা করে কেবলমাত্র মুসলমানদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে টাকা পাইয়ে দিয়ে ভোট কেনা হয়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়নের প্রতিটি বোর্ড বা সমিতির মাথায় মুসলমানদের বসানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিগত কংগ্রেস বা বামেদের সময়ে একই ছবি দেখা গিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর মতো প্রকাশ্যে মুসলমান তোষণ দেশের কোনও রাজ্যে হয়নি। আইনগত ভাবে সরকারি সুবিধা পাইয়ে দিতে ইতিমধ্যেই মুসলমানদের ভেতর সৈয়দ-সহ তিনটি জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে বাকিদের ওবিসি তালিকাভুক্ত করেছে মমতা-সরকার। ফলে যোগ্যতা না থাকলেও সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে শুরু করে, বিভিন্ন প্রকল্পের নামে সরকারি টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বিগত দশ বছর ধরে। এর পাশাপাশি মসজিদ এবং কোনও মসজিদের ভেতর খারিজি মাদ্রাসা থাকলেই সেখানে নিয়ম ভেঙে সরকারি সাহায্য দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা কিনা ক্যাগের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ২০১৯ সালের মহেশতলা বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দুলাল দাসের এক লাখেরও বেশি ব্যবধানে জয়লাভের পর ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের বিতর্কিত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'মুসলমানদের ভোট আমরা পেয়েছি। আর কারও ভোটের দরকার নেই'। বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদম্ভে মুসলমানদের দুধেল গোরু বলেছিলেন। এর কোনও প্রতিবাদ শোনা যায়নি। কারণ যে গোরু দুধ দেয় তার লাথিও সহ্য করতে হয়। তোষণের আরও বড়ো উদাহরণ হলো তৃণমূল কংগ্রেসের স্পনসরশিপে শহিদ মিনার ময়দানে ২৩টি ইসলামি উগ্রবাদী গণসংগঠনের সভা। যেখানে পাকিস্তানের জঙ্গি হাফিজ সৈইদ, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া-সহ-অন্যান্য ভারত বিরোধীদের সমর্থন করে মোদী তথা বিজেপি বিরোধী ভাষণ দেওয়া হয়। সমর্থন জানানো হয় মমতার তিস্তা জল বণ্টনের বিরোধিতাকেও। রাজ্য গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়েছে, প্রবল পাকিস্তান ও জাকির নায়েক সমর্থক এবং হিন্দু বিদ্বেষী ও একটি ইসলামপন্থী বাংলা দৈনিকের মালিক ও সম্পাদককে এই ২৩ জোটের মুখপাত্র হিসেবে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যসভার সদ্য প্রাক্তন এই সম্পাদককে রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী পত্রিকা চালানোর অনুদান হিসেবে মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেন।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। মিম এই নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানিয়েছে। অনেকের ধারণা উগ্র ও কট্টর মৌলবাদী ওয়াইসির দল এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটবে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটভিত্তি হলো মুসলমানরা। এর ফলে লাভবান হতে পারে বিজেপি। রাজ্যের সামাজিক ও রাজনীতির খবর যারা রাখেন তাদের জানা মুসলমান

বঙ্গে বিভাজন

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় বিভাজনের কারিগর কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেস। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট এবং ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার মূল চাবিকাঠি ছিল মুসলমানদের হাতে। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী মুসলমান অধ্যুষিত ১০টি জেলার মোট ১২৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৯০টি আসনে জয় পেয়েছিল। আবার ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রবল মোদী হওয়ার মধ্যেও তৃণমূল মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখে। সেবার, তৃণমূল পেয়েছিল রাজ্যের মোট মুসলমান ভোটের ৬৩ শতাংশ। কংগ্রেস পেয়েছিল ১৬ শতাংশ এবং বামেরা ৯ শতাংশ। হিন্দু ভোট ভাগ করে মুসলমানদের ব্লক ভোটিঙের সুবিধা নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার খেলা পশ্চিমবঙ্গে অনেকদিন ধরেই চলছে।

রামনামে অপমান

'রামনামে' অপমানিত। শুনেছেন কখনো? হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রামের নামে অপমানিত বোধ করেন। একবার নয় একাধিকবার। মাননীয়ার প্রতিবাদের ধরনটাও বিরল। তাঁর প্রতিবাদ প্রচার মাধ্যমে স্থান পায় সর্বাগ্রে, হয়তো ওটাই তাঁর বাসনা। তাই তো প্রশ্ন উঠেছে এই রামনামের অ্যালার্জি কি তবে সংখ্যালঘুদের খুশি করতে?

মাত্রই মৌলবাদী নন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের বড়ো অংশ অবশ্যই মৌলবাদী। তারা রাজনীতি-সহ জীবনের প্রতিটি বিষয়কে ধর্মীয়করণ করেন। বিভিন্ন ধরনের সুযোগ লাভের জন্য ধর্মীয় অবস্থানগত প্রয়োজনে এবং এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মগুরুদের নির্দেশে তারা প্রায় সবাই বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। ফলে মিম এলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য ভোট হারাতে পারেন মমতা এমনটাই ধারণা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিমের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা শুনে বলেছিলেন, বিজেপি নিজের সুবিধার জন্য মিমকে ডেকে আনছে। চলতি জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ মিমের নেতা আসাদুদ্দিন ওয়াইসি কলকাতায় আসেন ভোট পর্যালোচনা করতে। সে সময় এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তিনি আজীবন বিজেপি তথা মোদীজীর বিরোধিতা করে যাবেন। বিজেপির কোনও সুবিধা হয় এমন কাজ করবেন না। আমৃত্যু বিজেপি বিরোধী কাজ করবেন।

কথা রেখেছেন ওয়াইসি। কলকাতা প্রেস ক্লাবে গুঞ্জন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তিনি বোঝেন এই রাজ্যে সাফল্য মেলা কঠিন। তাই নিজের পছন্দের ব্যক্তি বা দলীয় নেতাদের তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রার্থী করাবেন। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে লোক দেখানো প্রার্থী দেবে মিম। ওয়াইসি কলকাতায় এসে ফুরফুরা শরিফে গিয়ে সেখানকার তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সমর্থক এবং সুবিধাবাদী ও অর্থলোভী ধর্মগুরু ত্বহা সিদ্দিকির বৈমাত্রেয় ভাই আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে বৈঠক করেন। এই আব্বাস সিদ্দিকি নিজেও একজন ধর্মগুরু। তিনিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সময় দেবী বলে অবিহিত করেছিলেন। পরে ত্বহার সঙ্গে স্বার্থের লড়াইতে পিছিয়ে পড়েন আব্বাস। এই লড়াইতে মুখ্যমন্ত্রী ত্বহাকে সমর্থন জানান। এরপর আব্বাস তৃণমল বিরোধী হয়ে পড়েন। মিম নেতা ওয়াইসি সরেজমিনে দেখতে এসেছিলেন আব্বাস সিদ্দিকির জনভিত্তি কতটা আছে। তবে জানা গিয়েছে আব্বাসের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি খুব বেশি সন্তুষ্ট নন। এই রাজ্যে মুসলিম লিগ-সহ কয়েকটি মুসলমান প্রধান দল অনেকদিন থেকেই আছে। নির্বাচনে অংশও নেয়। প্রতিবার মিলিত ভাবে তিন থেকে পাঁচ শতাংশ ভোট পায় এই দলগুলি। ওয়াইসি কিন্তু চান না মিম ও এই দলগুলি মিলিত ভাবে ভোটে লড়াই করুক। তাহলে হয়তো তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটতে পারে।

ওয়াইসি কলকাতা ছাড়ার পর পরই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর টুইটারে লেখেন ২০২১ সালের নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল ৩০ শতাংশ এগিয়ে থেকে লড়াই শুরু করবে। সকলেই জানেন রাজ্যে এখন ২৮ শতাংশ মুসলমান ভোটার আছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী পাঁচশো কোটি টাকা নিয়ে পরামর্শ দিতে আসা প্রশান্ত কিশোর এই মুসলমান ভোটারদের দিকে তাকিয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন। মিমের সঙ্গে তৃণমূলের গোপন আঁতাতের বড়ো উদাহরণ হলো সম্প্রতি নন্দীগ্রামের তেখালিতে মমতার জনসভা। মুসলমান অধ্যুষিত এই এলাকার জনসভায় সংগঠিত

ভাবে মিমের সমর্থকদের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মিমের সমর্থকদের নিয়ে আসা হয়েছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মিমের রাজ্য নেতা জাহিরুল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, জনসভা হয় খোলা মাঠে। ফলে সেখানে যে কেউ যেতে পারে। আর মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তো যাওয়াই দরকার। তৃণমূলের সঙ্গে গোপন আঁতাতের কথা মানতে চাননি তিনি।

মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দুই ২৪ পরগনা জেলায় মুসলমান ভোটারের সংখ্যা বেশি। এই সব জায়গা মিমের প্রভাব সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে। এই জেলাগুলিতে এক সময় মুসলমানদের ভেতর বামেদের প্রবল প্রভাব ছিল। কাস্তে হাতুড়ির ছত্রছায়ায় থাকা সেইসব বাম নেতা কর্মীরা পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শিবিরে আসেন। তাঁদের ভেতর অনেকেই বিভিন্ন কারণে ক্ষুব্ধ। তাঁদের একটা খুবই ক্ষুদ্র অংশ হয়তো কংগ্রেসকে সমর্থন করতেও পারে কিন্তু বিজেপির পতাকা গ্রহণে দ্বিধা থাকবে। এই অংশ অবশ্যই মিমকে সমর্থন জানিয়েছে। ফলে মিম নিজের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের পালে হাওয়া না দিলে বেশ কিছু ভোট পাবেন ওয়াইসি। পশ্চিমবঙ্গের এই জেলাগুলিতেই নয় অন্যত্রও প্রাক্তন বাম, বর্তমানে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলি আছেন। সকলেই জানেন টাকা ছড়িয়ে এবং ক্ষমতা প্রদান করে বিরোধীদের দলে টানতে পারদর্শী তৃণমূল নেত্রী। ইতিমধ্যেই মিমের রাজ্য নেতাদের বশীভূত করার কাজ শুরু হয়েছে। মিম জানে এই রাজ্যে একটিও আসন নিজ শক্তিতে দখল করার ক্ষমতা আপাতত তাঁদের নেই। কিন্তু মিমের লক্ষ্য বৃহত্তর ইসলামিক দেশ গঠনের। সেই কারণেই এই রাজ্যে শক্ত জমি গড়তে চাইছেন ওয়াইসি। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে তৃণমূলে নিজের নেতাদের নাম লেখানোর কাজ চলছে। ক্ষমতার লোভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবিরোধীদের হাতের পুতুল হতেও রাজি। মিম এই লক্ষ্যে সফল হতে শুর করেছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের একটি অংশের মানুষ নিজেদের প্রগতিশীল উদার সেকুলার আরও অনেক কিছু ভাবতে ভালোবাসেন। এই প্রগতিশীল তথাকথিত সেকুলাররা 'প্রতিবেশীকে জানুন' কর্মসূচিতে নিজেদের উজাড় করে দেন। কিন্তু নিজের আত্মীয়রা বিপদে পড়লে মুখ ফিরিয়ে নেন। রাজ্যের প্রকৃত চিন্তাবিদরা মনে করেন, মিম নিয়ে যারা উদাসীনতার ভান করেন সেই সব সেকুলারদের দেশভাগের ইতিহাস মনে রাখা উচিত। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের অপর পিঠ মিম সাফল্য পেলে সর্বনাশের আরেকটি পেরেক পোঁতা হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

With Best Compliments from :

A
Well
Wisher

রটনা থেকে রটন্তী কালী সমন্বয়ের রূপ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

'মা, আমার মা।

স্নেহময়ী মা আমার। কল্যাণময়ী তুমি প্রীতিদায়িনী, আপন বক্ষপটে আগলে রাখো তুমি সন্তানকে। তোমার করুণা প্রতিমহূর্তে নিষ্ণাত করুক। আমাদের সমৃদ্ধ করুক শান্তি ও সম্পদে। পার্থিব ও অপার্থিব সে সম্পদ সবসময় হোক--- আমার, আমাদের সকলের।

মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে এমনই আকুল প্রার্থনায় মুখর হয়ে ওঠে ভক্ত কণ্ঠ। রক্তজবার অঞ্জলিতে ঢাকা পড়ে মাতৃচরণ। আবেগে— আবেশে মাতৃধ্যানে মগ্ন হয় সন্তান।

মা কালী কখনও তিনি শ্যামা, দীপান্বিতার কার্তিকের মহানিশায় হয় তাঁর আরাধনা। কখনও মাঘের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে হয় তাঁর অর্চনা রটন্তী কালী রূপে। জ্যৈষ্ঠে তিনিই আবার ফলহারিণী--- সর্বফল প্রদায়িনী। লক্ষ্মীর মতোই শ্যামার পূজাতে এমনিভাবেই বঙ্গভূমির শাক্ত সমাজ বছরের বিভিন্ন সময় মাতৃআরাধনায় রত হন--- মায়ের বিশেষ বিশেষ রূপকে সামনে রেখে পার্থিব নানা ফল পাওয়ার আশায়।

রটন্তী শব্দের অর্থ প্রিয়তম। মাতৃসাধকের জীবনের প্রিয়তম রূপ এই রটন্তী কালী। রটন্তী কালী বা কালীর ওই প্রিয়তম রূপটি পূজা হয় মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতে। এইদিন বা তিথিটি রটন্তী চতুর্দশী নামেও খ্যাত। বিশেষ করে এই দিনটির মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূমের জনজীবনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ওই অঞ্চলে দিনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বহু জায়গাতেই বারোয়ারি তলায় ধুমধাম করে এই দেবীর আরাধনা হয়। ওইদিন স্নান করে সকলে সর্বপাপ থেকে মুক্তির প্রার্থনা জানান। কালী হলো সর্ব কলুষহারিণী, দেবী শক্তিরই একটি রূপ কালী। যুগে যুগে দেবী আবির্ভূত হন অসুর শক্তির বিনাশে। তাঁর সেই অসুরনিধন যজ্ঞে তিনি নিজে পরিগ্রহ করেন বিশেষ বিশেষ রূপ। আবার তাঁরই শক্তিতে তাঁরই সহায়ক হয়ে তিনি আবির্ভূত হন বিশেষ বিশেষ রূপে। তিনি দেবীরই শক্তি। দেবী স্বরূপা, শুধু দৈবী লীলার স্বরূপ প্রকাশের জন্য তাঁর ভিন্ন কোনো নাম হয়। ভক্তজনের কাছে পূজিত হন তিনি মহাশক্তি রূপেই। আদ্যাদেবী বা মহাশক্তিরই এমন একটি রূপ কালী। তাঁর উদ্ভব নিয়েও আছে

নানা কাহিনি।

চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায় শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ পর্বে রয়েছে কালীর উদ্ভবের কথা। শুম্ভ-নিশুম্ভর সেনাপতি রক্তবীজ। দৈবশক্তিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রক্তবীজ। তার দেহের একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে জন্ম নেয় তারই অনুরূপ আরেক রক্তবীজ। ফলে দেবী তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না কিছুতেই। সেই সময় রক্তবীজ সংহারের জন্যই তাঁর দেহ থেকে উদ্ভব হয় কালীর। রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই লোলজিহ্বায় লেহন করেন তা, ফলে রক্তবীজ হতশক্তি হয়। তখনই দেবী বধ করেন তাকে অতি সহজে।

সাধকদের কথা, রক্ত এবং বীজ শব্দ দুটির মিলিত রূপ রক্তবীজ। রক্তের অর্থ কামনা-বাসনা, লাল ও শোণিত এবং বীজ অর্থ জননের আধার অর্থাৎ যা থেকে জন্ম হয়। সব মিলিয়ে রক্তবীজ হলো যাবতীয় কামনা-বাসনার আধার। সেই আধারকে পান করেন কালী। ওই ভাবেই ভক্ত তথা মানুষকে তিনি করেন কামনা-বাসনা মুক্ত—নির্মোহ। মানুষ তখন পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার মোহ পরিত্যাগ করে শুদ্ধসত্ত্ব— পরমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথ তাঁর খুলে যায়।

চণ্ডী বা পুরাণের কালী হলেন বাসনা নাশিনী ভয়ংকরী ভীমা। তাই গভীর অন্ধকার রাতে তাঁর পূজা হয়। সেই আধার দূর করে আলোর বার্তা নিয়ে মানবজীবনে আসে ঊষা। সমস্তরকম পাপ— সমস্ত রকম ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতার কলুষ মুক্ত হয় মানুষ। মানবজীবনে কালী হলেন কলুষহারিণী।

কালের মধ্যেই আলোর নাচনের প্রতীক দেবী কালী। ভীষণা, লোলজিহ্বা, নরমালা শোভিতা, খড়্গ হস্তা, শবরূপী শিবের বুকে উত্থিতা দেবী একইসঙ্গে অশুভ বিনাশিনী— বরদায়িনী। দিন-রাত্রির মতোই মানবজীবনের দিশা এই দেবীকালী।

দেবী ভীষণা— প্রচণ্ডা। কিন্তু তিনি মা। তাঁর উগ্র রূপের আড়ালে রয়েছে সন্তানের জন্য সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, স্নেহ ছলছল দুটি আঁখি। সেই কারণেই ভক্তের কাছে তিনি করুণাময়ী মা— স্নেহময়ী জননী। ভক্ত তার মনের মাধুরী দিয়ে মা-কে নানা রূপে দেখতে চায়। সাজাতে চায় তার মনের মতো করে। ভক্তের সেই আকাঙ্ক্ষার কারণেই তিনি কখনও শ্যামা, কখনও রক্ষাকালী, কখনও শ্মশানকালী, কখনও ফলহারিণী, রটন্তী কালী, কখনও বা তিনি দক্ষিণা কালী। সন্তানকে কিছু দেওয়ার জন্য সতত ব্যস্ত তিনি।

রটন্তী কালীপূজার সঙ্গে কৃষিনির্ভর বাঙ্গলার কৃষি উৎপাদনেরও একটা পরোক্ষ যোগ রয়েছে। আমন ধান ঘরে তুলে নবান্ন উৎসবের শেষে নতুন করে শস্য বপনের মাসের কিছুটা অবসর কালে রটন্তী কালীপূজা হয়। মাঠে তখনও নতুন তাজা তরিতরকারি ও শস্য রয়েছে। তা দিয়ে হয় মায়ের পুজো। বলা যায় মকর-সংক্রান্তির পর এটিই বাঙ্গালির ঘরের প্রথম কালীপূজা। প্রাণের প্রিয় মা-কে এই সময় নিবেদন করা হয় নানা উপাচার। নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয় গর্ভধারিণী জননীকে পরিতৃপ্ত করার মতোই নানা খাদ্যদ্রব্য। স্নেহময়ী মায়ের কোলে মাথা রাখায় তৃপ্তি, সব পাওয়ার দেশে যাওয়ার আনন্দ আর পরম ভরসায় ভক্ত মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে মাতৃ আরাধনায় মগ্ন হয়— গর্ভধারিণী মাতা হিসেবে কল্পনা করেই।

রটন্তী কালীপুজো অনেকটাই পরিবারিক পুজো। আবার দক্ষিণেশ্বরের মতো বিভিন্ন কালী মন্দিরেও অমন করে বিশেষ পুজোর আয়োজন হয়। কোনো বিশেষ মন্ত্র নয়, কালীপুজোর নির্দিষ্ট ধারাতেই এই পুজো হয়। এই পুজো উপলক্ষ্যে পশুবলিও হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বহু জায়গাতেই পশুবলি বন্ধ হয়েছে। পরিবর্তে চালকুমড়ো, আখ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। এই বলি প্রসঙ্গে বহু সাধকই বলে থাকেন, পুজোয় পশুবলি হলো একটি প্রতীক। বলি কথার প্রকৃত অর্থ মনের সমস্ত কুপ্রবৃত্তিকে শাণিত খড়্গের দ্বারা ছিন্ন করে মানুষ হয়ে ওঠা— সব অর্থেই। প্রতিটি মানুষ যেদিন মদ-মাৎসর্য-লোভ ইত্যাদির মতো অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করে, তা থেকে মুক্ত হয়ে দেবীর আরাধনা করতে পারবে— সেইদিনই সার্থক হবে প্রকৃত মাতৃ বন্দনা— তাঁর আরধনা।

রটন্তী কালী পুজোর উদ্ভব সম্পর্কে রয়েছে একটি পৌরাণিক কাহিনি। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রটন্তী কালীপুজোর একটি উৎস। বৃন্দাবনে আয়ান ঘোষ ঘরনি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। তাঁদের এই লীলারঙ্গের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা শাশুড়ি ও ননদ— জটিলা ও কুটিলা। প্রতিমুহূর্তে আয়ানের কানে বিষ ঢালেন ওই দুজন। কিন্তু শাশুড়ি-ননদের দৃষ্টি এড়িয়ে কদম্ব বনে নিয়মিত মিলিত হন রাধা তাঁর প্রণয়সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে।

সেদিন রাতেও প্রেম অভিসারে যান শ্রীমতী রাধা। আড়ালে আড়ালে থেকে জটিলা-কুটিলা দেখতে লাগল সেদিন রাধা-কৃষ্ণকে লীলারঙ্গে মাততে। স্বচক্ষে সব কিছু দেখাতে আয়ানকে ডেকে আনেন তাঁরা। স্বামীর কাছে ধরা পড়ার ভয়ে রাধা শরণ নেন শ্যামসুন্দরের। বলেন তাঁকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য।

ত্রিভঙ্গ রঙ্গে বাঁশি হাতে শ্যাম সেদিন রাধিকাকে বলেন রাঙাজবা দিয়ে তাঁর পুজো করতে। জটিলা-কুটিলার সঙ্গে সেই কদম্ব বনে এসে পরমশাক্ত আয়ান দেখেন এক অপূর্ব দৃশ্য। দেখেন, চতুর্ভুজা শ্যামা দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিভঙ্গে। শ্রীমতী রাধা মনপ্রাণ দিয়ে পুজো করছেন তাঁর।

সে দৃশ্য দেখে চরম গ্লানিতে ভরে ওঠে আয়ানের মন। প্রতিদিন মনপ্রাণ দিয়ে শ্যামাসাধনা করেও তিনি তাঁর দর্শন পাননি। আর যার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের কুটিল বিষ ছড়াচ্ছিলেন তাঁর মা ও বোন, সেই রাধার সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন স্বয়ং শ্যামা। প্রাণদগ্ধ আয়ান বারবার ক্ষমা চেয়ে ঘরে ফেরেন রাধাকে নিয়ে।

সেদিন শ্যাম নিজে শ্যামা হয়ে সব দ্বন্দ্বের নিরসন করলেন। শ্যাম-শ্যামা— পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি— এই তত্ত্বের অপূর্ব প্রকাশ ঘটল সেদিন।

এই ঘটনার কথা রটে যায় চারিদিকে। আর সেই রটনা থেকে প্রচলন হয় রটন্তী কালীপুজার। প্রতিষ্ঠিত হয় সমন্বয়ের এক পরম তত্ত্ব। একদিক থেকে মিলন ঘটে শাক্ত ও বৈষ্ণব দর্শনের। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় ধর্মসাধনার এক বিচিত্র রূপ। ■

একলিঙ্গ শিবের আশীর্বাদধন্য বাপ্পা রাওল

অমিত ঘোষ দস্তিদার

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বাপ্পা রাওল মেবার রাজবংশের সংস্থাপক। পৌরাণিক বংশাবলী অনুসারে মেবারের রাজবংশকে সূর্যবংশ বলে মানা হয়। বাপ্পা রাওল গুহিল বংশীয় ক্ষত্রিয়। বাপ্পার মা শত্রুর ভয়ে গর্ভবতী অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে বশিষ্ঠ রাওল নামে এক পুরোহিতের কাছে আত্মগোপন করেন। আরাবল্লী উপত্যকায় বসবাসকারী ভীলদের সঙ্গে ছোট্ট বাপ্পা বড়ো হতে থাকে।

কিশোর বয়স থেকে বাপ্পা রাখালের কাজ শুরু করে। বালকেরা তাঁকে দলপতি হিসাবে মানত। বালকদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হলে বাপ্পা মীমাংসা করে দিত। বালকরা বাপ্পার সম্মতি না নিয়ে কোনো কাজ করত না। বাপ্পা যে গোরুগুলির চারণ-কাজ করত তার মধ্যে একটি গোরু কিছুদিন ধরে দুধ দিচ্ছিল না। ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ রাওল বেশ কয়েকদিন ধরে ওই গোরুটি দুধ দিচ্ছে না দেখে বাপ্পাকে সন্দেহ করতে থাকেন এবং তার প্রতি সন্দেহের কথা বাপ্পার মায়ের কাছে প্রকাশ করেন। বাপ্পার মায়ের সমস্ত রাগ ছেলের ওপর পড়ে। মা বাপ্পাকে জানান যে তিনি এমনটা আশা করেননি। এমনটা হলে তো তাঁদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়টি নষ্ট হয়ে যাবে! বাপ্পা কিছুই জানত না। মায়ের কাছে সবকিছু শুনে সে খুবই বিস্মিত হলো। কিন্তু মায়ের কাছে কোনো কথা না বলে মাথা নীচু করে শুধু বলল, সে এ কাজ করেনি, তবে এমনটা কেন হচ্ছে তা তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন এবং তাঁর প্রতি যে অপবাদ তৈরি হয়েছে তা সে দূর করবেই।

পরের দিন থেকে বাপ্পা গোরুটির প্রতি নজর রাখতে শুরু করে। প্রতিদিনের মতো সকালে খাবারের পুঁটলি নিয়ে মাকে প্রণাম করে সমস্ত গোরু-সহ বাপ্পা বেরিয়ে পড়ে। গোচারণ ভূমিতে গোরুগুলিকে বিচরণ করতে দিয়ে নিজে একটি গাছতলায় বসে, তবে তার লক্ষ্য কিন্তু নির্দিষ্ট গোরুটির দিকেই থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাপ্পা দেখতে পায় গোরুটি অন্যদিকে চলতে শুরু করেছে। বাপ্পা গোরুটির পিছন পিছন চলতে শুরু করে। বহু পাথুরে পথ অতিক্রম করে গোরুটি বাঁশবনের ভিতর প্রবেশ করে একটি শিবলিঙ্গের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বাপ্পা বিস্ময়ে দেখতে থাকে শিবলিঙ্গের মাথায় গোরুটির দুধের বাট থেকে দুধ ঝরে পড়ছে। বালক বাপ্পা ওই দৃশ্য দেখে প্রণাম করে। প্রণাম শেষে সে একজন ঋষিকে দেখতে পায়। বাপ্পা এগিয়ে গিয়ে মুনিকে প্রণাম করে। মুনি বাপ্পার পরিচয় জানতে চাইলেন। বাপ্পা তার বংশ পরিচয় থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই বলল। মুনি বাপ্পাকে স্নেহস্পর্শ করে বলেন, তিনি যোগীরাজ হারিত ঋষি। ওই গোরুটি হলো কামধেনু কন্যা নন্দিনী, শিবভক্তিই যার একমাত্র লক্ষ্য। আর ওই স্থানের শিবলিঙ্গটি হলো ভগবান একলিঙ্গ।

সিদ্ধপুরুষ যোগীরাজ হারিত বাপ্পাকে জানালেন, তিনি বাপ্পার জন্যই দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন। তিনি ভগবান একলিঙ্গের পরম ভক্ত। ঈশ্বর তাঁকে বিশেষ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন, যা আজ বাপ্পার সঙ্গে সাক্ষাতে পূরণ হলো। ঋষি হারিত বাপ্পাকে পরের দিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে বলে জানালেন, বাপ্পার সঙ্গে দেখা করে তাকে আগামীদিনের দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য আশীর্বাদ করে কল্যাণলোকে ফিরে যাবেন। বাপ্পা ঋষি হারিতকে প্রণাম করে বাড়ির পথে চলতে লাগল। বাড়ি ফিরে দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা সবকিছু ভুলে গিয়ে আগামীদিনের মেবারের চিন্তায় ব্যাকুল হলো।

ঋষি হারিত একলিঙ্গ শিবের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। একলিঙ্গ শিবের সাধনা করে বাপ্পা রাওল তাঁর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। একলিঙ্গ শিবের অনুগ্রহেই বাপ্পা রাওল মেবার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাপ্পা রাওল ঋষি হারিতের কথামতো পরেরদিন সকালে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায় আশ্রমে ঋষি হারিত নেই। নানা দিকে খুঁজে মহর্ষির দেখা তিনি পেল না। হঠাৎ বাপ্পা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখে ঋষি হারিত বিমানে কল্যাণলোকে গমনরত। বাপ্পা চিৎকার করে ঋষি হারিতকে আহ্বান করলে হারিত তাঁকে জানান যে বাপ্পা একটু দেরি করে এসেছে। তবু তিনি বাপ্পাকে আশীর্বাদ করতে চেয়ে মুখ খুলতে বলেন, বাপ্পা মুখ খুললে ঋষি হারিত তাঁর মুখের চর্বিত পান বাপ্পার মুখের দিকে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ঋষির মুখের চর্বিত পান দেখে বাপ্পা মুখ বন্ধ করে নেন। চর্বিত পান তাঁর পায়ের উপর পড়ে। ঋষি হারিত বাপ্পাকে বললেন ওই চর্বিত পান ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদ, বাপ্পা তা মুখে গ্রহণ করলে বাপ্পার জীবনের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হতো, কিন্তু যেহেতু সে মুখে গ্রহণ করেনি এবং পান বাপ্পার পায়ে পড়েছে তাই বাপ্পার দ্বারা মেবারে রাজ্য স্থাপিত হবে এবং কখনও তাঁর পরাজয় হবে না।

বাপ্পা রাওল কর্তৃক মেবারে রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এক উজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা হয়। মেবারের ইতিহাস আরম্ভের দিন থেকেই ভগবান একলিঙ্গ তাঁদের আরাধ্যদেব হিসাবে মান্যতা পেয়ে আসছেন। একলিঙ্গেশ্বরের কৃপায় মেবার অজেয় ও অভেদ্যরূপে ইতিহাসে শৌর্য-বীর্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

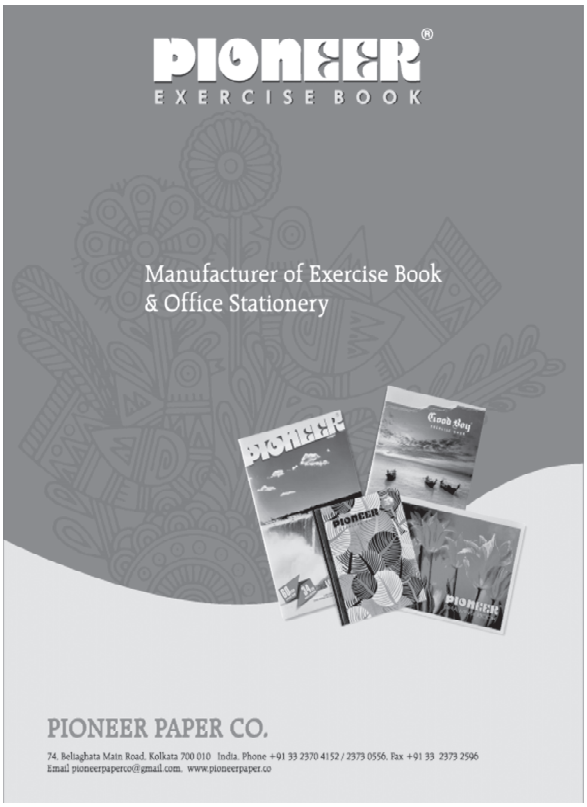

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

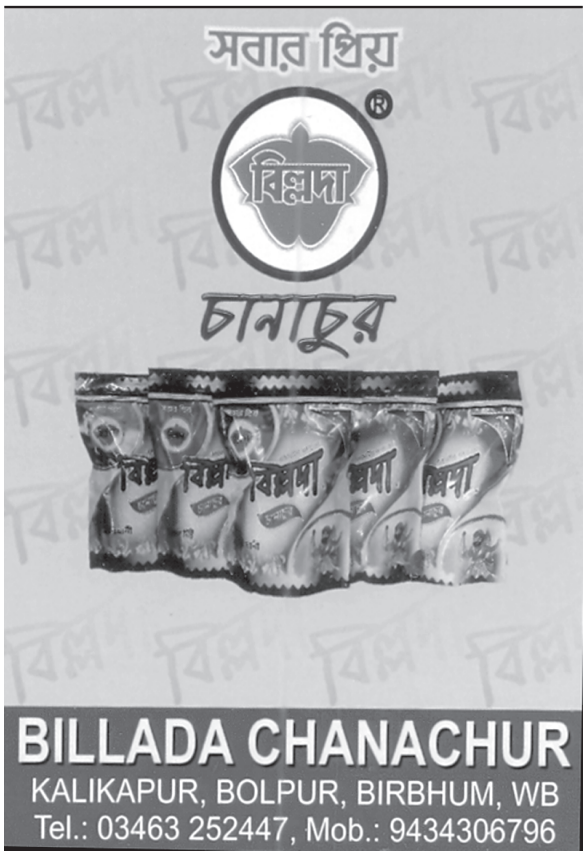

ওয়েসিকে পরোক্ষে উৎসাহ জোগাচ্ছেন মমতা

মাননীয়া বারে বারে মিমকে প্রচারের আলোয় এনে সংখ্যালঘু ভোটকে মিমমুখী করতে সচেষ্ট হচ্ছেন। তার কারণ একটাই, বিরোধী দলের দিকে সংখ্যালঘু ভোটের চোরাস্রোতকে আটকানো। ফলে মিমের উৎসাহদাতা হিসেবে রাজ্যের শাসক দলের ভূমিকাকে নিছক হালকা ভাবে দেখলে হবে না।

বিশ্বপ্রিয় দাস

মমতা ব্যানার্জি ইদানীং সামান্য হলেও পূর্বের নানা কথা বিস্মৃত হচ্ছেন। আজকাল তিনি একটি দলের বিরুদ্ধে নানা কথা বলছেন। সেই দলটি ইতিমধ্যে বিহার নির্বাচনে একটু ভালো ফল করেই পশ্চিমবঙ্গে ঝাঁপিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের শরিক হয়েছে ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা। তিনি আবার হুংকার দিয়েছেন, রাজ্যের সবকটি বিধানসভা আসনে প্রার্থী দেবেন। ভাবুন, বিষয়টি কীভাবে এগিয়েছে? মাননীয়া এই 'মিম' নামক একটি হায়দরাবাদের সাম্প্রদায়িক দলের প্রতি ইতিমধ্যেই হুংকার দেগেছেন। কেননা তারা এসে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাবে এমনটাই আশঙ্কা করছেন শাসক দলের সুপ্রিমো। পশ্চিমবঙ্গে এই রাজনীতির ধর্মীয় মেরুকরণের বিষয়টা ছিল। আর সেই বিষয়টাকে সামনে রেখে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাড়বাড়ন্তের চেহারটাকে সামনে এনেছে তোষণের রাজনীতি। যে তোষণের রাজনীতি সংখ্যালঘু সেন্টিমেন্টের তকমাধারী ওই সম্প্রদায়ের সমস্ত গতিবিধির মধ্যে এনেছে, রাজ্যের প্রশাসন, আইন না মানার একটা লাগাম ছাড়া মানসিকতা। গত সাড়ে নয় বছরে মাননীয়ার নানা ভাবভঙ্গি সেই মানসিকতাকে আরও উগ্র চেহারা দিয়েছে। উসকে দিয়েছে রাজনৈতিক ভাবে অন্য মেরুকরণের।

আমাদের রাজ্যে সেই অর্থে গাণিতিক হিসেবে ২৯ থেকে ৩২ শতাংশ ভোট আছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাতে। এই হিসেবের সিংহভাগ যার ঝুলিতে যাবে, সেই হবে রাজ্যের ক্ষমতাসীন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দশ

ফুরফুরা শরিফের আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে বৈঠকে ওবেইসি।

ফ ঃ ৫

কদম এগিয়ে যাবার শক্তিধারী। এই বিষয়টা বামেদের করায়ত্ত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁদের শেষের চার বছর এই সম্প্রদায়ের থেকে একটু দূরত্ব তৈরি হয়। সেই সময়ে বর্তমান শাসক দল এই দূরত্বটাকে কাজে লাগিয়ে এই সম্প্রদায়ের কাছাকাছি আসে।

একটু সেই কাছে আসা আর তোষণের দিকে তাকানো যাক। মাননীয়া হিজাব পরে সব অনুষ্ঠানে গিয়ে অংশ নিচ্ছেন। আর তোষণের যত রকম কায়দা আছে সেটি তিনি তাঁর ভাষণ ও শারীরিক ভাষায় প্রকাশ করছেন। এই বিষয়টাকে সামনে রেখে বিভিন্ন ভাবে ওই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাথারা নানা দরকষাকষির মধ্যে দিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে নেমে পড়ে। আর মাননীয়ার দল সেই আখের গুছিয়ে দিতে সাহায্য করে। একটা উদহরণ দেওয়া যাক, পুরোহিতভাতার অনেক আগেই চালু হয়ে গিয়েছিল ইমামভাতা। আরেকটি উদাহরণ, অনেকের মনে আছে, টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের কথা। মাননীয়া কীভাবে ঝেড়ে ফেলেছিলেন ওই ইমামকে। কেননা ক্ষমতার দম্ভে ওই ইমাম এমন কিছু কাজ করে ফেলেছিলেন, যেটা মাননীয়ার পক্ষে খুব একটা ভালো ছিল না। ত্বহা সিদ্দিকি বা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির কথা না হয় নাই-বা বলা গেল। তার পর দুর্গা ঠাকুরের বিসর্জন ও মহরম একসঙ্গে পড়ায়, সরকারি নির্দেশে পিছিয়ে গিয়েছিল বিসর্জন। এরকম উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে।

এবার আসা যাক শিক্ষাক্ষেত্রের শিক্ষকদের কথা। প্রাথমিক শিক্ষকরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেও আজ পর্যন্ত প্রাপ্য সম্মানটুকু আদায় করতে পারেননি। বিশেষ করে বেতন কাঠামোর ক্ষেত্রে। একই পদে থেকে মাদ্রাসা শিক্ষকদের থেকে বেতন কতটা কম পান, সেটা যে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে, শিক্ষকদের প্রশ্ন করলেই জানতে পারা যাবে। এই বেতন বৈষম্য কীসের স্বার্থে? কেন দূর করা হলো না আজও? সেই উত্তর চাইবার ক্ষমতা কারোর নেই। কয়েক মাস আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সংগঠন অনশনে বসেছিল। তাঁদের সঙ্গে কী ব্যবহার হয়েছিল, সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না। তাঁরা চেয়েছিলেন যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের বেতন। পুলিশের লাঠিও খেতে হয়েছে শিক্ষকদের।

রাজ্যে আইন কি শুধু ওই সম্প্রদায় ছাড়া আর সবার? এই প্রশ্ন তোলেন সবাই, অবশ্যই আড়ালে আর আবডালে। কেননা ওই সম্প্রদায়কে এই আইন না মানার অধিকার পরোক্ষে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল দিয়েছে। করোনা মহামারীতে যখন রাজ্যের সমস্ত মানুষ তটস্থ, সেই সময় করোনা স্বাস্থ্যবিধি ও লকডাউন ঘোষণা করা হলো। আমাদের শহরে রাজাবাজার, মল্লিক বাজার, গার্ডেনরিচ-সহ বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় সেটা একেবারেই মানা হলো না। দেখা গেল না পুলিশি তৎপরতা। অথচ রাজ্যের অন্য এলাকায়, যেখানে সংখ্যাগুরু মানুষের বাস, সেখানে পুলিশি কঠোরতা, তৎপরতা দেখা গেল একেবারে কঠোর নিয়ম মেনে। মাননীয়া একবারের জন্যও ওইসব এলাকায় যেখানে বিন্দুমাত্র মানার লক্ষণ ছিল না, সেখানে কঠোর হবার নির্দেশ সেই মুহূর্তে কেন দেননি? এই প্রশ্নের উত্তর শিশুও দিতে পারবে।

মাননীয়া 'মিম' এই রাজ্যের নির্বাচনে প্রার্থী দেবার সাহস পাচ্ছে কীভাবে? এ প্রশ্নের একটাই উত্তর দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের ওই সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নগ্নভাবে তোষণ ও মাথায় তোলার কারণে সাহস পাচ্ছে মিম। যাদের হাত ধরে এই ওয়েসির দলের রাজ্য ও রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার ঘটছে, সেই সব পিরজাদারা একটা সময় মাননীয়ার দলের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল বলেই জানে রাজনৈতিক মহলের সব অংশই।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সিংহভাগ মাদ্রাসাই নানা উগ্রপন্থী সংগঠনের আঁতুড়ঘর। একথা বারে বারেই সংবাদপত্রের পাতায় উঠে এসেছে। ফলে কারা ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের নানা কাজের পরোক্ষে উৎসাহদাতা, সেটা আর বলে দিতে হয় না। এদিকে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ইতিমধ্যেই ওয়েসির 'মিম'-এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। এই তিনটি জায়গাতেই রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের অঙ্ক খুব ভালো জায়গাতেই ছিল। সেটাই ঘুরে গেছে মিমের দিকে। এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। এদিকে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জায়গা থেকেই তথাকথিত মিমের বেশ কিছু সদস্য রাজ্যের শাসকদলে যোগ দিয়েছেন। এখানেও একটা প্রচ্ছন্ন অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, এই সব সদস্যরা পরোক্ষে মিমের সঙ্গে শাসক দলের একটা লিঙ্ক হিসেবে কাজ করলেও অবাক হবে না কেউ। কেননা, মিম বিরোধিতায় শাসক দল ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি দেখাবার চেষ্টা করছে, আর পিছনে লিঙ্কম্যান দিয়ে যোগসূত্র স্থাপন করছে, অন্য রাজনৈতিক সমীকরণের উদ্দেশ্যে।

গত ২৮ তারিখের একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে পাশের রাজ্য, বিহারের বহু মানুষ কর্মসূত্রে বাঙ্গালি হয়ে দীর্ঘদিন বসবাস করছে। কিন্তু শিকড় আজও বিহারে। সেই সব প্রবাসীদের নিয়ে মাননীয়া তৃণমূল ভবনে একটি সভা করে যে নির্লজ্জ ভাবে ভোটের প্রচার করে তোষণ করলেন, নানা উস্কানিমূলক কথায় জাতিবিদ্বেষের জন্ম দিলেন, সেখানে, যদি এই সব বিহারের মানুষজন একটু অন্য রকমের পরিবেশ তৈরি করেন, তার দায় কিন্তু মাননীয়ার ওপর বর্তাবেই।

ফিরে আসি আগের প্রসঙ্গে মিমের আগমন রাজ্যের রাজনীতিতে অবশ্যই নতুন সমীকরণের জন্ম দেবে। অনেকে ভাবছেন সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরে প্রকারন্তরে সুবিধা শাসক বিরোধীদের। বাস্তবে কিন্তু উলটো। ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক মাননীয়ার দলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মাননীয়া বারে বারে মিমকে প্রচারের আলোয় এনে সংখ্যালঘু ভোটকে মিমমুখী করতে সচেষ্ট হচ্ছেন। তার কারণ একটাই, বিরোধী দলের দিকে সংখ্যালঘু ভোটের চোরাস্রোতকে আটকানো। ফলে মিমের উৎসাহদাতা হিসেবে রাজ্যের শাসক দলের ভূমিকাকে নিছক হালকা ভাবে দেখলে হবে না।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

বনবাসী গুরুমা কমলা সোরেন পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত

তরুণ কুমার পণ্ডিত

মালদা জেলার গাজোল ব্লকের গাজোল-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কদুবাড়ি থেকে ১ কিলোমিটার দূরে কোটালহাটি প্রাইমারি স্কুলের ঠিক পূর্ব দিকের 'ভারতীয় সনাতন সাঁওতাল কল্যাণ আশ্রমটি' আজ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মালদা জেলায় এই প্রথম এক প্রত্যন্ত অখ্যাত আশ্রম থেকে বনবাসী মহিলা কমলী সোরেন এবার ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মশ্রীতে ভূষিত হয়েছেন। কোনো রকম শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এই বনবাসী মহিলা কেবলমাত্র সমাজসেবার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে মূল্যবান এই পদ্মশ্রী পুরস্কার পেলেন। এখন প্রশ্ন হলো, তিনি সমাজের জন্য এমনকী কাজ করেছেন যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাকে এই সম্মান জানাল? মালদা জেলার গাজোল, হাবিবপুর ও কেন্দপুকুর এলাকায় সাঁওতাল সমাজের মধ্যে খ্রিস্টান হওয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিনের। পুরাতন মালদার পোপড়াতে রেখা হেমরম তাঁর আশ্রমে রামনবমী উপলক্ষ্যে বেশ কিছু সাঁওতাল পরিবার যারা প্রলোভনে পড়ে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন তাদের শুদ্ধি যজ্ঞের মাধ্যমে পুনরায় সনাতন হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনতেন। কমলী সোরেন ছোটোবেলায় এটা খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। তারপর রাজেন সাধুবাবার সংস্পর্শে এসে সেখান থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু।

ছোটোবেলা থেকে খুব কষ্টের জীবনযাপন করতে হয়েছে তাকে। সাঁওতাল সমাজে অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার পর কমলী সোরেনের একটি কন্যা সন্তানের জন্মের আগেই স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর বাবার বাড়িতে আশ্রয় না পেয়ে বটগাছতলায় কুঁড়েঘরে খেজুরপাতার মাদুর তৈরি করে ও বিক্রি করে দু'বছর কষ্টের মধ্যে তাকে জীবন কাটাতে হয়েছে। এরপর মেয়ে একটু বড়ো হলে ভগন কিসকুর সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কেন্দপুকুরে স্বপন মুর্মুর বাড়িতে স্বামীকে নিয়ে থাকাকালীন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। সেখানে একটি ছাত্রাবাস ও স্কুল খোলা হয় সনাতন সাঁওতাল কল্যাণ আশ্রমের নামে। কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। হঠাৎ দ্বিতীয় স্বামীও মারা যায়। কিছুদিন পর গাজোলের কোটালহাটিতে রাজেন সাধুবাবার কাছে দীক্ষা নিয়ে সাঁওতাল সমাজের মধ্যে সেবার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে কমলী সোরেন বনবাসী সমাজের মধ্যে সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো প্রচার করতে থাকেন। বনবাসী বাড়িতে তুলসীগাছ লাগানো, কোটালহাটির এই আশ্রমে ধুমধাম সহকারে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির আয়োজন করেন। প্রতি বছর সাঁওতাল সমাজের হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে এই দুই উৎসবকে কেন্দ্র করে। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

বনবাসীদের মধ্যে ধর্ম পরিবর্তনের প্রবণতা তাঁকে খুব আঘাত করে। মূলত ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান পরিবারের সঙ্গে মিশে হিন্দু সংস্কৃতির প্রচার এবং তাদের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেছেন গুরুমা কমলী সোরেন। তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা ছাড়াও বনবাসী সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কিছু পরিবারকেও গুরুমা হিন্দু সাঁওতাল সমাজে ফিরিয়ে এনেছেন। বনবাসীদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা, প্রয়োজনে আশ্রমে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা করা ও আপদ বিপদে পাশে দাঁড়ানোর কাজ করে চলেছেন এই বনবাসী গুরুমা। তিনি নিজে হতদবিদ্র হয়ে বনবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য লড়াই করে চলেছেন। এমন একজন গ্রাম্য মহিলার এবছর পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার খবরে স্বভাবতই খুশির হাওয়া বইছে গাজোল-সহ সারা মালদা জুড়ে। সাধারণ বনবাসী মহিলার এই অসাধারণ কাজের প্রেরণা পেয়েছেন গাজোলের দীর্ঘদিন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকা লক্ষ্মীরাম টুডুর কাছ থেকে। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের শ্রদ্ধা জাগরণ ও মহিলা সমিতির উপদেষ্টা টোলীর সদস্য কমলী সোরেন পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়ে বলেছেন, এটি তাঁর সমাজসেবার স্বীকৃতি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও রাজনৈতিক দল থেকে মালদার গৌরবজনক পুরস্কারে ভূষিত কমলী সোরেনকে সংবর্ধনা জানানোর পালা শুরু হয়েছে।

একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন সর্বক্ষণের জন্য গাজোল আশ্রমে থেকে বনবাসী সমাজের মধ্যে কাজ করতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি। এখন সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে বনবাসী শিষ্যদের মধ্যে এই গুরুমা সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসার যেমন করছেন তেমনি ধর্মান্তরিত বনবাসীদের কয়েকশো পরিবারকে হিন্দু ধর্মের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ করেছেন। গুরুদেব রাজেন সাধুবাবার কাছে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হয়ে নিজে কপালে তিলক কাটা ৫০ বছরের একজন সাধারণ অশিক্ষিত বনবাসী মহিলা কমলী সোরেনের পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়াকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন স্বাগত জানিয়েছেন। ▫

সাম্প্রতিক জাতীয় শিক্ষানীতি ও আমাদের শিশু

ড. বিভাসকান্তি মণ্ডল

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সর্বদা শিক্ষা সম্পৃক্ত। প্রাচীন ভারত তার বেদগান, সামগানের মধ্য দিয়ে 'আত্মদীপঃ ভব'র শিক্ষা দিয়েছে। পৃথিবীর সভ্যতাগুলির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক প্রভেদ রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র বাক্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'অন্যান্য সভ্যতা নগর হইতে সৃষ্ট আর ভারতীয় সভ্যতা অরণ্য থেকে সৃষ্ট। সুতরাং আমাদের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কোনোভাবেই ঔপনিবেশিক শিক্ষার আদলে চলা উচিত নয়। কিন্তু সেটাই চলে আসছে বলে শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের সংযোগ নেই বললেই হয়।' রবীন্দ্রনাথ বড়ো দুঃখে বলেছিলেন, আমাদের জীবনের ধারা থেকে সহস্র যোজন দূরে আমাদের শিক্ষার ধারা বর্ষিত হচ্ছে। যদিও স্বাধীন ভারতেও একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে, রাধাকৃষ্ণন, মুদালিয়র, কোঠারী থেকে ১৯৮৬-র জাতীয় শিক্ষানীতি— তবুও ঔপনিবেশিকতা থেকে আজও আমাদের মুক্তি ঘটেনি। শিক্ষা ক্ষেত্রের কাণ্ডারি শিক্ষকগণ আজও বেতন নয় অনুদান গ্রহণ করেন, কৃপাপ্রার্থীর মতো। ১৮৫৪ সালের উড সাহেবের দেওয়া তকমা অর্থাৎ গ্র্যান্ড-ইন-এইড আজও স্বমহিমায় বলবত। ১৯৮৬-র জাতীয় শিক্ষানীতি আমাদের কিছু আশা জাগিয়েছিল। বিশেষ করে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে, তাদের পুষ্টি প্রদানের ক্ষেত্রে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের প্রেক্ষিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল। দুঃখের বিষয়, সামান্য (অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ) মিড-ডে-মিলের বিষয়টাও শিক্ষকরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। প্রাথমিক পরিবেশের মধ্যে কোথায় ইতিহাস আর কোথায় ভূগোল এত বছর ধরে হাতড়ে হাতড়েও ধরতে পারছেন না তারা। অনেকের কাছে পরিবেশ বইটি 'দরছাড়া' তকম পেয়েছে। অনেকদিন থেকেই আশানুরূপ ফল না পেয়ে, মূল্যায়নের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিমার্জন করে ২০০৫ সালে, আরও পরিবর্তিত পরিবেশ উপযোগী করে ২০০৯ সালে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেম ওয়ার্ক তৈরি করা হয়। তথাপি আমাদের মতো দাসত্ব শৃঙ্খলে যুগ যুগ ধরে অভ্যস্ত মানুষদের পরিবর্তন করা শিক্ষাব্যবস্থার কর্ম নয়!

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, আমাদের পা থাকবে মাটির গভীরে আর মস্তক থাকবে সমুন্নত আকাশে। তাই খোলা আকাশের নীচে, শালবীথি বা আম্রকুঞ্জে তিনি জ্ঞানের সাধনা করেছিলেন। কিছুটা তেমনই আশা জাগে সাম্প্রতিক জাতীয় শিক্ষানীতি দেখে। ন'টি অ্যাজেন্ডাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শেকড় সংযুক্ত রেখেই শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহারে, শিশুর সার্বিক বিকাশের বিশেষ পদক্ষেপ। 'ভিশন' শব্দের মধ্যে একটা দর্শনের ভাব আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের ভাবটি ইংরেজি ভাষায় যথাযথ ব্যক্ত করার চেষ্টাতেও ঔপনিবেশিক মানসিকতা প্রকাশিত। যে কোনো ভারতীয় ভাষাতে বোঝালে অনেক স্পষ্ট হতো। নেতিভাবনা চলেই এল! আসলে বিষয়টা শিক্ষা অর্থাৎ আমাদের আত্মিক সংযোগের বিষয়। স্বদেশের শিক্ষা 'নেশন' শব্দ দিয়ে কিছুই বোঝানো যায় না, রবীন্দ্রনাথের কথাতেও তার সমর্থন পাই। ফলত শিক্ষার সঙ্গে যে প্রজ্ঞার যোগ তা 'নলেজ' শব্দটিতে আদৌ ব্যঞ্জিত নয়। আর প্রজ্ঞার বিকাশ যে সংজ্ঞায় পৌঁছে দেবে, যেটাই শিক্ষার চরম বা পরম দর্শন তাকেই বা কোনো বিদেশি শব্দে ধরা যাবে। সত্যকারের বিশ্ব নাগরিক হয়ে ওঠা তো একটা দর্শনের বিষয় যা সংজ্ঞা না জাগলে সম্ভব নয়। জ্ঞান দিয়ে তো নয়ই। প্রজ্ঞার নিরন্তর অনুশীলনে আত্মবোধ ও বিশ্ববোধের সংজ্ঞায় পৌঁছালে তবে না পরিবর্তনশীল বিশ্বায়নের মধ্যে সমুন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে পারবো 'আমি তোমাদেরই লোক'। ভারতীয় বোধ থেকে দেখলে বলা যায় এই ভাবটি বা দর্শনটি নিহিত রয়েছে উল্লিখিত 'ভিশন'-এ।

মূলসূত্রগুলি যে পূর্বের শিক্ষা কমিশনের ভাবনায় ছিল না তা নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে ন্যায়, সাম্য, সবার অন্তর্ভুক্তি, বৃত্তি শিক্ষার ভাবনা ইত্যাদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কথার কথা হয়ে আছে! না হলে 'এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি' কথাটির উৎপত্তি হতো না! একুশ শতক হলো কারিগরি বিদ্যার যুগ। তাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা যথার্থ হচ্ছে। তবে মুখস্ত বিদ্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে শিক্ষাকে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের উল্লেখ আর তার ব্যবস্থা এবং যথাযথ প্রয়োগে এনসিটিই নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবে। সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য আবহ প্রয়োজন। যান্ত্রিক জীবনে তা অসম্ভব। সেই আবহ কোনো নিয়মের শিকড়ে সম্ভব নয়।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রধান কারণ কপি পেস্ট। বিদেশের অনুকরণটা আদৌ বিশ্বায়নের উপযোগী হওয়া নয়। তাকে নিজের ভূমি অনুযায়ী কর্ষণ করাই প্রকৃত চর্চা, প্রজ্ঞা। ধান চাষের থেকে চা-চাষে অনেক বেশি লাভ, সুতরাং দার্জিলিংয়ের সঙ্গে পুরুলিয়া বাঁকুড়াতেও চাষ করলে যা ফল হওয়ার তাই হয়েছে। আর একটা কারণ, শিক্ষকদের উপযোগী করার জন্য বিশেষ ট্রেনিং-এ পার্টি পণ্ডিতরা রিসোর্স পার্সন হন! এর থেকে মুক্ত করার দায় এনসিটিই, এসসিআরটি, এনসিইআরটি বা অন্য কোনো সংস্থার নেই। এটা সামাজিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়। সেটি সম্ভব হলে শিশু শিক্ষার প্রাথমিক বিকাশগুলো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই হতে পারে। ৩ থেকে ৬ ও ৬ থেকে ৮ বছর বয়সের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্তভাবে তা মানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। খেলা ভিত্তিক শিক্ষার বিষয়টিকেও যদি 'খেলাই শিক্ষা' পর্যায়ে উন্নীত করতে পারি আমরা, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা আপনা থেকে স্ফূরিত হবে। প্রজন্মও রক্ষা পাবে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল এই ভাবনাটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক তৈরি করতে হবে। এক প্রজন্ম শিক্ষক তৈরি করতে পারলে তারপর শিক্ষক জন্ম নেবে। তখন সমস্ত আঁধার ঘুচে যাবে।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক)

বাংলা সিনেমার চারজন সফল কমেডিয়ান

রূপশ্রী দত্ত

নবদ্বীপ হালদার

বাংলা ছবির হাস্যরসের অভিনেতা হিসেবে কিংবদন্তী শিল্পী— ভানু, জহর ছাড়াও যাঁদের নাম মনে আসে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। তিনি পর্দা ও মঞ্চ দুটিতেই সক্রিয় ছিলেন।

হরিধনের আসল নাম ছিল দীনবন্ধু। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে কাজ করতেন। অভিনেতা ছাড়াও তিনি ছিলেন গায়ক। তাঁর দক্ষতা ছিল উচ্চাঙ্গ সংগীতে। রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান দেখেছিলেন।

হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত ও অভিনয়ের জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে কয়েকটি হলো 'অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউস', 'হীরক রাজার দেশে', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', পরশপাথর', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'ধন্যিমেয়ে', 'ফুলেশ্বরী'।

পরবর্তী অভিনেতা, তুলসী চক্রবর্তী। তিনি গোয়ারী নামে একটি ছোটো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী ভারতীয় রেলের কর্মচারী ছিলেন। সেইসূত্রে অবিভক্ত বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে তিনি বসবাস করেছেন। তিনি কলকাতায় এলে জ্যেষ্ঠতাতের গৃহে থাকতেন। তিনি যাত্রাদলের নেপথ্য গায়ক ছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন অভিনেতাদের সঙ্গে। তিনি ব্রহ্মদেশের সার্কাস পার্টিতেও যোগদান করেছিলেন। তিনি সার্কাসের ক্লাউনের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনি ছবিতে কখনওই মেক-আপ ব্যবহার করতেন না। সাদা ধুতি ও উপবীত ছিল তাঁর পোশাক।

সাড়ে চুয়াত্তর ছবিটি ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য। উত্তম-সুচিত্রার সঙ্গে 'একটি রাত' ও 'চাওয়া পাওয়া'তেও অভিনয় করেছিলেন। গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই হয়েছিলেন 'পথের পাঁচালি'-তে। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন— আমেরিকায় জন্মালে তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি অস্কার পুরস্কার পেতেন।

শেষ জীবনে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যেই কাটিয়েছিলেন। সিনেমাপাড়া টালিগঞ্জ থেকে তাঁর বাসস্থান শিবপুর পর্যন্ত তাই তাঁকে পায়ে হেঁটেই যেতে হতো। তাঁর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির নাম হলো 'দীপ জ্বেলে যাই' (১৯৫৯), 'মায়ামৃগ' (১৯৬০), 'শুন বরনারী' (১৯৬০), 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (১৯৬০), 'কেরি সাহেবের মুন্সি' (১৯৬১)।

পরবর্তী হাস্যরসের অভিনেতা হলেন নবদ্বীপ হালদার। তিনি মঞ্চ ও চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি ১৯১১ সালে বর্ধমান জেলার শোনপলাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাপর্বের পর তিনি আর অধ্যয়নের সুযোগ পাননি। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে যোগদান করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আংশিক সময়ের জন্যও কাজ করতেন।

নবদ্বীপের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হলো 'পঞ্চশর', দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়। 'সাড়ে চুয়াত্তর' (১৯৫৩), 'দুয়ো', 'কঠিন মায়া' (১৯৬১), 'দুই বেচারা' (১৯৬০), 'সাহেব বিবি গোলাম' (১৯৬১)।

তুলসী চক্রবর্তী

কৌতুকাভিনেতা শ্যাম লাহার সঙ্গে যুগ্মভাবে লরেল হার্ডির মতো অভিনয় করেছিলেন। তার মধ্যে 'দুয়ো' অন্যতম। এক অননুকরণীয় বিচিত্র অনুনাসিক কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর। তাতেই শ্রোতা-দর্শকের প্রাথমিক হাস্যখোরাক জুটত। বেতারের ন্যাট্যানুষ্ঠানে গ্রামোফোন রেকর্ডেও কৌতুকাভিনয় করে তিনি শ্রোতা ও দর্শকদের অভিভূত করে দিতেন। স্ব-কণ্ঠের অনুনাসিক গান আজও অনেক বর্ষীয়ান ব্যক্তি মনে রেখেছেন।

শ্যাম লাহা

চতুর্থ হাস্যরসের অভিনেতা হলেন শ্যাম লাহা। তাঁর আসল নাম কাশীনাথ শীল। তিনি বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তিনি সংগীত ও তবলাবাদনে উৎসাহী ছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল লক্ষ্ণৌয়ের বেঙ্গলি ক্লাবে তাঁর অনুষ্ঠান দেখে চমৎকৃত হয়ে তাঁকে বিখ্যাত পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় 'চণ্ডীদাস' ছবিতে অভিনয় করে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল শ্যাম লাহার সঙ্গে একটি স্বাধীন প্রোডাকশন কোম্পানি করেছিলেন। বেতার ও মঞ্চে কৌতুক পরিবেশন করে, তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কৌতুকাভিনয়ে তিনি ও নবদ্বীপ হালদারের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হতো। 'কালোছায়া', 'নৌকাডুবি', 'মাণিকজোড়', 'হানাবাড়ি'। 'দুই বেচারা', নাম শুনলেই বোঝা যায় এতে দুই হাস্যরসের অভিনেতাকে নিয়েই এর কাহিনি। ■

লোভে নিজের কপাল ভেঙে যায়

বহুকাল আগের কথা। এক গ্রামে কালু নামে এক রাজমিস্ত্রি বাস করত। ভালো রাজমিস্ত্রি হিসেবে এলাকায় তার সুনাম ছিল।

তার ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে তার কাজের ডাকও আসত। একদিন রাতে বাড়ি ফেরার পর তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তার বউ জিজ্ঞেস করল— কী হলো, মালিক কিছু বলল বুঝি? —না না, আমার কাজ নিয়ে কেউ কথাই বলতে পারবে না, এতটা নিখুঁত ভাবে কাজ করি আমি, কালু বলল। — কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে মনটা তোমার ভালো নেই, কালুর বউ বলল। — হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। আমার মন ভালো নেই আজ। আমি সবার জন্য এত বাড়ি, প্রাসাদ, অট্টালিকা বানিয়ে দিই, অথচ আমি থাকি কুঁড়েঘরে। তোমাকেও একটু সুখে রাখতে পারলাম না। অট্টালিকা না হোক, ছোটো একটা বাড়ি তো তৈরি করে দিতে পারতাম, বলল কালু। — তাতে কী হয়েছে। তুমি মন দিয়ে কাজ করো, দেখবে একদিন না একদিন কেউ তোমার দুঃখ বুঝবে, বলল কালুর বউ।

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় বাইরে থেকে কেউ কালুকে ডাকল। বাইরে এসে দেখল একজন লোক। সে বলল জমিদার মশাই তোমাকে ডাকছেন, এখনই গিয়ে দেখা কর। কালু গেল জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে। জমিদার বললেন, তোমাকে একখানা ভালো দোতলা বাড়ি বানিয়ে দিতে হবে। কালু বলল গত বছরই তো দুটো বাড়ি বানিয়েছেন। আবার বাড়ি কী করবেন? —একটা বাড়ির খুব দরকার পড়েছে, কাজে লেগে যাও, জমিদার বললেন।

কালু বাড়ি ফিরে এসে ভাবল এবার নিজের দিকটাও ভাবতে হবে। জমিদারের কাছ থেকে বেশি টাকা নিয়ে কম দামি মালমশলায় বাড়ি বানিয়ে দেব আর সেই টাকায় নিজের একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলব। সেই মতো কালু জমিদারের থেকে টাকাপয়সা নিয়ে কম দামি খারাপ উপকরণ দিয়ে দেখতে সুন্দর একটা বাড়ি বানাতে শুরু করল। কালু নিজেও বুঝতে পারল যে, এই বাড়ি বেশিদিন টিকবে না। আর সেটা সারাতে জমিদার তাকেই ডাকবে। তখন আবার জমিদারের থেকে টাকা পাবে। তার ফলে সে দ্বিগুণ টাকা দিয়ে নিজের জন্য খুব ভালো একটা মজবুত বাড়ি অনায়াসে বানাতে পারবে।

বাড়ি তৈরি হবার কয়েকদিন পর জমিদার কালুকে ডেকে বলল — কালু, এই বাড়িটি আমি তোমার জন্য বানিয়েছি। এটি তোমাকে দিলাম। আমার ইচ্ছা তুমি সপরিবারে এই বাড়িতে বসবাস কর। তুমি আমার অনেক বাড়ি বানিয়েছ। এই গ্রামের অনেকের বাড়ি তোমার হাতেই তৈরি। কিন্তু তোমার নিজের কোনো বাড়ি নেই। তাই তোমাকে আমি এই বাড়িটি উপহার দিলাম।

কালু এবার মহাবিপদে পড়ে গেল। সে জানে এই বাড়ি বেশিদিন টিকবে না। কিন্তু জমিদারের কথা অমান্য করাও যায় না। শেষপর্যন্ত কালু আর কালুর বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে এই বাড়িতে বসবাস করতে লাগল। নিজের বাড়ি পেয়ে কালুর বউয়ের খুব আনন্দ। সময় এভাবে কাটতে লাগল। একবছর পর দেওয়ালে ফাটল ধরতে শুরু করল। কালু বুঝতে পেরে জিনিসপত্র সরিয়ে রাখতে লাগল। কালুর এরকম আচরণ দেখে তার বউ ভাবল কিছু একটা হতে চলেছে। একদিন রাতে ছাদ সহ দেওয়াল ভেঙে পড়ল। সারারাত ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় বসে রইল কালুমিস্ত্রি আর তার বউ।

পরদিন খবর পেয়ে জমিদার এসে বললেন, তোমার বানানো বাড়ি তো খুবই ভালো। এটা এক বছর না হতেই ভেঙে পড়ল কেন? কালু তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, আজ্ঞে আমার কপালে কুঁড়েঘরই লেখা আছে। জমিদার বললেন, না না, তা কী হয়? এই টাকাগুলি রাখ আর ভালো করে সারিয়ে ফেল। কারণ এই বাড়িটা তোমার।

কালু বুঝল জমিদারমশাই সবই বুঝে গেছেন। রাতে কালু ঘরে ফিরলে বউ জিজেস করল কেন এমনটা হলো? কালু সমস্ত কথা খুলে বলল। আর বলল দেখো আমি কোনোদিন লোভ করিনি। কিন্তু লোভে পড়ে এই বাড়িটি বানানোর সময় জমিদারকে ফাঁকি দিয়েছিলাম। এবার বুঝতে পারলাম, লোভ করলে নিজের কপালই ভেঙে যায়।

আকাশ দেববর্মন

ভারতের পথে পথে

চাম্বা

ধৌলাধার পাহাড়ে ৯৯৬ মিটার উচ্চতায় রাবি ও চেনাব উপত্যকা জুড়ে ৩ কিলোমিটার ব্যাপ্ত পাহাড়ি শহর চাম্বা। মাঝখান রয়েছে ১ কিলোমিটার লম্বা-চওড়া চৌগান অর্থাৎ প্রমোদ উদ্যান। শহরের চারপাশ ঘিরে প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী। রয়েছে অজস্র মন্দির। দশম শতাব্দীর মধ্য ভারতীয় প্রতিহারশৈলীতে নির্মিত সব মন্দির। শিব ও বিষ্ণু চাম্বার উপাস্য দেবতা। শহরে ঢুকতেই পাহাড়চূড়োয় দশম শতাব্দীর চামুণ্ডা মন্দির। ডোগরা বাজারের পিছনে চৌগানের পশ্চিমে লক্ষ্মীনারায়ণ অর্থাৎ বিষ্ণু মন্দির। শিখরশৈলী ছ'টি মন্দিরের কমপ্লেক্স– ৩টি শিব, ৩টি বিষ্ণুর। বিগ্রহ শ্বেতপাথরের। প্রবেশদ্বারে কলস নিয়ে গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি। এছাড়াও একই মন্দিরে আলাদা আলাদা চত্বরে বিগ্রহ রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত মহাদেব, গৌরীশঙ্কর, ত্র্যম্বকেশ্বর, লক্ষ্মী-দামোদর, মহাকালীর । আগস্ট মাসে সপ্তাহব্যাপী মিঞ্জার উৎসবে বহু পর্যটক ভিড় করেন।

জানো কি?

ভারতের উল্লেখযোগ্য নদীর উৎস মোহনা ও দৈর্ঘ্য

- গঙ্গা–গঙ্গোত্রী হিমবাহ–বঙ্গোপসাগর–২৫২৫ কিমি।
- গোদাবরী–ত্র্যম্বক পর্বত–বঙ্গোপসাগর–১৪৬৫ কিমি।
- কৃষ্ণা–মহাবালেশ্বর শৃঙ্গ–বঙ্গোপসাগর–১৪০০ কিমি।
- কাবেরী–ব্রহ্মগিরিশৃঙ্গ– বঙ্গোপসাগর– ৮০৫ কিমি।
- মহানদী–সীয়াওয়ারা শৃঙ্গ–বঙ্গোপসাগর–৮৫৮কিমি।
- ব্রহ্মপুত্র–মানসসরোবর– বঙ্গোপসাগর–২৯০০কিমি।

ভালো কথা

রামমন্দিরের জন্য

ছোটোবেলা থাকেই আমার খুচরো পয়সা জমানোর অভ্যাস। মা-বাবা বা কোনা আত্মীয় ভালোবেসে পয়সা দিলেই আমি আমার মাটির ভাঁড়ে জমাই। আমি গান খুব ভালোবাসি, এবার ঠিক করেছিলাম জমানো পয়সা দিয়ে একটা গিটার কিনবো। কিন্তু যখন শুনলাম অযোধ্যায় বিশাল রামমন্দির হচ্ছে এবং তার জন্য বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে তখন ঠিক করলাম এই টাকা আমি রামমন্দিরের জন্য দেব। সেদিন যখন পাড়ার কাকুরা অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের বাড়ি এল তখন আমি আমার ভাঁড়ে জমানো পাঁচশো টাকা তাদের হাতে দিলাম। তারা আমাকে রামমন্দিরের ছবিসহ একটা কুপন দিয়েছে। আমার খুব ভালো লাগলো যে মন্দিরের জন্য আমিও কিছু দিতে পারলাম।

দিব্যশ্রী মজুমদার, নবম শ্রেণী, ৭৯৬, এস এইচ কে বি সরণী, কল-৭৪।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) নু শ প্র অ	(১) হা ক তু স্য কৌ
(২) শ ত্ম প্র আ	(২) ণা সূ ম র্য প্র

২৫ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) বাধাবিপত্তি (২) ভাবগতিক

২৫ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) ফলভারাবনত (২) প্রয়োজনাতিরিক্ত

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভম সেন, খাতড়া, বাঁকুড়া। (২) কৃত্তিকা মণ্ডল, সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (৩) সৈকত পাল, ত্রিমোহিনী, দঃ দিঃ। (৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা ৪৯

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২।।

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ শিক্ষার প্রয়োজন

ইন্দুমতী কাটদরে

সত্য ও ধর্ম :

আমরা সবাই জানি যে সত্য ও ধর্ম এই দুটিই হচ্ছে এই সৃষ্টিকে ধারণ করবার মূল তত্ত্ব। ধর্ম হচ্ছে বিশ্ব নিয়ম। এই সৃষ্টির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মেরও উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমান সৃষ্টির প্রলয়ের পরও নতুন সৃষ্টির সৃজনের জন্য যে বীজ অবশিষ্ট থেকে যায় তার সঙ্গে ধর্মের বীজও বেঁচে থাকে। এই ধর্মকে জানা, বোঝা ও স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। তা মানুষের জন্য প্রমুখ রূপে এবং সর্ব প্রথম করণীয় কাজ।

সত্য হচ্ছে এর বাচিক অভিব্যক্তি। ধর্ম যা বলে না তা সত্য নয় এবং যা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা ধর্ম নয়। সত্য হচ্ছে কেবল মানুষের জন্য, অপরদিকে ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ সৃষ্টির জন্য। মানুষ ও অবশিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে কেবল এটুকুই পার্থক্য যে অবশিষ্ট সৃষ্টি ধর্মের অনুসরণ স্বভাববশতই করে থাকে, অপরদিকে মানুষকে ধর্ম তথা ধর্মের পালন করা শিখতে হয়। সে স্বভাববশত ধর্মের পালন করে এমনটা নয়। সত্য কেবল মানুষের জন্য এজন্যই, কেননা মানুষই বাণীর ব্যবহার করতে পারে এবং সত্য হচ্ছে বাণীর বিষয়। নিজের মন, বুদ্ধি ও অহংকার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে অসত্যও বলতে পারে এবং অধর্মের আচরণও করতে পারে?

অথচ এই কারণে যখন সে সত্য বলে এবং ধর্মের আচরণ করে তখন তাতে তার মহত্ত্ব ধরা পড়ে। যে অসত্য বলতেই পারে না অথবা অধর্মের আচরণ করতেই পারে না, সে ধর্ম কী আর অধর্ম কী এর মাঝে বিভ্রান্ত হয় না। অসত্য বললে তাৎক্ষণিক স্বার্থ পূরণ হতে পারে, অনায়াসে সমস্ত সুবিধা প্রাপ্ত হতে পারে যে এমনটা জানে না তার অজ্ঞানতা বশত কৃত ধর্মাচরণ ও সত্য ভাষণের কোনো মহত্ত্ব নেই।

মানুষের জন্য এই দুটি কথা কেবল মহত্ত্বপূর্ণই নয় বরং অনিবার্য। এর অভাবে সর্বত্র দুঃখ, দৈন্য, রোগ ও দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়বে। অসত্য ভাষণের প্রচলন হলে কেউ কাউকে বিশ্বাসই করবে না। অধর্মের আচরণ হলে কেউ কোথাও সুরক্ষিতই থাকবে না। এই সৃষ্টি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই চলতে পারে। এমনটা বলা হয় যে সত্যযুগে মানুষ স্বাভাবিক রূপেই ধর্মাচরণ করত। ধর্মাচরণ করত, এই জন্য সত্য ভাষণও করত। কিন্তু ত্রেতাযুগ থেকেই মানুষের ধর্মাচরণ ও সত্যভাষণ ক্ষীণ হতে লাগল। এবং আইন, বিচার, দণ্ড— এই তিনটিরই প্রবর্তক রাজ্যের উদয় হলো। এর সঙ্গেই ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্যের ব্যবহার শুরু হলো এবং ব্যবহার থেকে উৎপন্ন সংঘর্ষও শুরু হলো। অহংকার জনিত বল ও দম্ভ তথা মনের কোনো মোহ, মদ, মাৎসর্যের মতো ভাবসমূহের প্রবর্তন শুরু হয়ে গেল। চুরি, ছল, কপট, অত্যাচার ইত্যাদিতে বুদ্ধি বিনিয়োগ হতে আরম্ভ করল। এই সময়ে বেদ প্রকট হলো এবং বেদের জ্ঞাতারাও জন্মালেন। বেদ সত্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন, বেদের স্রষ্টা ও জ্ঞানী সত্য এ ধর্মকে জানতেন। কিন্তু বেদজ্ঞরাও অধর্মে প্রবৃত্ত হতেন। রাবণের মতো ত্রেতাযুগের বেদজ্ঞ চরিত্র একথাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। রাবণ বেদের জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু অহংকারের কারণে নিজের সম্পদ ও সৈন্যের ওপরই তার বেশি গর্ব ছিল। কারণ সে শুধু জ্ঞানী ছিল এমনটা নয়, সে পরম ভক্তও ছিল। নিজ ভক্তি ও তপশ্চর্যা দ্বারা সে ভগবান শঙ্করকেও বশে করে নিয়েছিল। কিন্তু শক্তি ও সম্পদের প্রভাব ধর্ম ও সত্য থেকে বেশি ছিল। এজন্য ধর্ম ও সত্যের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছিল। তখন থেকে আজ অবধি ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অসত্যের সংঘর্ষ চলছেই। এই সংঘর্ষ মানুষের মনেও আছে এবং যেখানে যেখানে মানুষের অস্তিত্ব আছে সেখানে বাইরের জগতেও আছে। এই সংঘর্ষের কারণ মানুষই। বাইরের সংঘর্ষের স্রোতও হচ্ছে তার মনের সংঘর্ষেরই ফল। মানুষ সত্য ও ধর্মকে জানে না এমনটা নয়। সত্য ও ধর্মের অনুসরণই হলো জ্ঞান। কিন্তু এই কথাগুলির ওপরে অজ্ঞানের আবরণ ছেয়ে থাকার কারণে সে অসত্য ও অধর্মের আচরণ করে। কখনও কখনও সে অসত্য ও অধর্মকে জেনেও মনের দুর্বলতার কারণে অনুচিত ব্যবহার করে। সত্য ও ধর্মের আচরণ তার জন্য সহজ হয় না।

> সত্য ও ধর্মের শিক্ষাকে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তার প্রয়াস খুব গৌণভাবে হয়। ধর্ম এখন বিবাদের বস্তুতে পরিণত হয়েছে আর সত্য আইনের। আইন হচ্ছে যান্ত্রিক এবং সত্যকে বুঝতেও অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে সত্য ও ধর্মের শিক্ষার জন্য যে অনেক বেশি প্রয়াস করার আবশ্যকতা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষার মুখ্য প্রয়োজন হচ্ছে মানুষকে সত্য ও ধর্ম শেখানো। সেই কাজ সরল নয়। ধর্মের তত্ত্ব জানা কতটা দুষ্কর তাকে বোঝাতে গিয়ে একটি সুভাষিতে হয়েছে—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নৈকো মুনির্যস্য মতং প্রমাণম্

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। অর্থাৎ তর্কের কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। তর্ক যে কোনো কিছুকেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, স্মৃতিসমূহ সব ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে। সমস্ত মুনি অর্থাৎ মনীষী এমন কথা বলেন যাকে প্রামাণ্য মনে করবার ইচ্ছা হয় না, ধর্মের তত্ত্ব এমন গহ্বরে লুকিয়ে আছে যে আমাদের জন্য মহাজ্ঞানীরা যে পথে গমন করেন সেই মতো চলাই শ্রেয়স্কর। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা কঠিন। তর্ক তার বুদ্ধিতে কুলায় না, তাই মানুষ তর্কের গভীরে তলিয়ে যায়। স্মৃতিগুলো কালানুরূপ হয়ে থাকে এজন্য কালবাহ্য হয়ে থাকে। অনেক স্মৃতির মাঝে কোনটা মান্য বিবেক দ্বারা বুঝতে হয়, সেই বিবেক তার কাছে থাকে না। বিবেক না থাকার কারণ তার এ বিষয়ে শিক্ষা থাকে না। মনীষীদের বিষয়টাও স্মৃতির মতোই। তাঁদের কথায় মানুষের শ্রদ্ধা থাকে না। অতঃপর মানুষ অন্য কোনো ঝামেলায় না পড়ে স্বয়ং যাকে মহাজন মান্য করে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করে। কাকে মহাজ্ঞানী মানা যায় তা নিশ্চিত করবার বিবেক অথবা পরম্পরা যদি তার কাছে থাকে তবে এটা হচ্ছে সহজ পথ। কিন্তু এই বিবেক হওয়াই কঠিন, কারণ এমন বিবেকের শিক্ষা ধর্মই দেয়। এজন্য সাধারণ মানুষ হোন বা অসাধারণ তাকে ধর্ম শিখতেই হয়।

ধর্ম ও সত্য শেখবার জন্য মানুষের হৃদয়ে প্রেম চাই। হৃদয়ে প্রেম না থাকলে সে দয়া ও করুণা অনুকম্পা ও উদারতা, মৈত্রী ও বন্ধুত্বের ব্যবহার করতে পারে না। এমন ভাব যার কাছে নেই তার হৃদয়কে কঠোর বলা হয়। কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তির আনন্দের অনুভব হতে পারে না। তার জীবনে রসবোধ আসে না। তাই প্রথমে তো হৃদয়ের শিক্ষা চাই। দ্বিতীয়ত, বিবেক চাই। সত্যতো বুদ্ধিরই বিষয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সত্য জানা আবশ্যক। তাত্ত্বিক সত্য জানা সরল কিন্তু ব্যবহারিক সত্য জানাটাই কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ সোনা ও মাটি দুটোই হচ্ছে পৃথ্বী নামক মহাভূত। এটা জানা সরল কিন্তু সোনা দিয়ে অলংকার তৈরি হয় আর মাটি দিয়ে ঘট তৈরি হয় এটা জানবার জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান চাই। জগতের ব্যবহার এতটাই জটিল হয় যে প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে সত্য, অসত্য ধর্ম অধর্ম নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়। এমন ধর্ম ও সত্যকে জানা সবার জন্য আবশ্যক।

শিক্ষা ধর্ম শেখায়। সত্যের পরিচয় শেখায়। হৃদয়, বুদ্ধি, মন ইত্যাদির সত্য ও ধর্মের আচরণের জন্য সক্ষম করে তোলে। অর্থাৎ শিক্ষার এটা প্রথম দায়িত্ব হওয়া উচিত। একথা সত্য যে বর্তমানে অবস্থা এ থেকে অনেকটা বিপরীত। কিন্তু অবস্থা বিপরীত হলেও তা যে ন্যায়সঙ্গত এমনটা নয়। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনও আছে। সেটাও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই প্রথম প্রয়োগকে ছাড়া ওই সব প্রয়োজনের কোনো সার্থকতাই থাকে না। সত্য ও ধর্মের শিক্ষাকে আজ মূল্য শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। কখনও কখনও তাকে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তার প্রয়াস খুব গৌণভাবে হয়। ধর্ম এখন বিবাদের বস্তুতে পরিণত হয়েছে আর সত্য আইনের। আইন হচ্ছে যান্ত্রিক এবং সত্যকে বুঝতেও অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে সত্য ও ধর্মের শিক্ষার জন্য যে অনেক বেশি প্রয়াস করার আবশ্যকতা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিক্ষা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় :

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্র ধারণার উপর আলোচনা করেছি। জনসমাজ, ভূমি ও জীবনদৃষ্টি মিলে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তিনটির একটির সঙ্গে অপরটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জনসমাজ ভূমিকে মাতা মনে করে। এটা স্বাভাবিক। এর জন্য কোনো সংবিধানের আবশ্যকতা নেই। ওই ভূমি ও জনসাধারণের স্বভাবই ওই রাষ্ট্রের জীবন দৃষ্টি। রাষ্ট্র জীবনের সব ব্যবস্থা, জনগণের সমস্ত ব্যবহার ওই স্বভাবের অনুসারেই তৈরি হয়। এই জীবন দৃষ্টি ওই রাষ্ট্রের শিক্ষার ভিত্তি এবং শিক্ষা থেকেই জীবনদৃষ্টি পুষ্ট হয়ে থাকে। এমন জীবনদৃষ্টি ও শিক্ষা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রজীবন সমরসতাপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও সুখী হওয়া উচিত। এর অর্থ হলো রাষ্ট্রের সকলের সুখী হওয়া উচিত। শুধু এটুকুই নয়, এক রাষ্ট্রের মঙ্গলে বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রেরও মঙ্গল— এরকমভাবে সুখী হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের এককের তাৎপর্য হচ্ছে এক এক ব্যক্তি, সম্পূর্ণ সমাজ এবং পঞ্চমহাভূতাত্মক পৃথিবী প্রকৃতি, বৃক্ষ, বনস্পতি ও প্রাণীজগৎ। এসবের এক সঙ্গে সমরস, সুখী ও সমৃদ্ধ করতে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হয়, অনেক কিছু ব্যবস্থাও করতে হয়।

রাষ্ট্রীয়তার ব্যবস্থা সমূহকেই ব্যবস্থাধর্ম ও জীবনশৈলী বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারত রাষ্ট্রে জীবনদৃষ্টির ধারণাগুলো হচ্ছে—

- এই সৃষ্টি আত্মতত্ত্বের বিস্তার।
- জীবন এক ও অখণ্ড।
- সৃষ্টির সকল সজীব ও নির্জীব পদার্থগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ হচ্ছে একাত্মতার সম্বন্ধ।
- সজ্জন ব্যক্তি অপরের বিচার প্রথমে করে, পরে নিজের।
- ত্যাগ ও সেবা হচ্ছে ব্যবহারের আদর্শ।
- অন্ন হচ্ছে পবিত্র।
- বিদ্যা, অন্ন, ওষুধ ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু নয়।
- একই সত্যকে মনীষীগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে বলে থাকেন।
- উপাসনার পথ বিভিন্ন হলেও ঈশ্বর এক। উপাসনার সকল পথে গন্তব্য হচ্ছে একই। এজন্যই সর্বপন্থ সমাদরই হচ্ছে বিদ্বজ্জনদের আচরণ।
- জগতে সব ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যমান পদার্থ ও মানুষের সহ অস্তিত্বের সম্মান করা উচিত।
- স্বাধীনতা সেবার মূল অধিকার। এজন্য সব পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সম্মান করা উচিত।
- জগৎ মানুষের উপভোগের জন্য তৈরি হয়নি, মানুষই সবার রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে।
- জগতে সবকিছুর ব্যবহার পরিবার ভাবনা থেকে হওয়াটাই আকাঙ্ক্ষিত।

এমন আরও অনেক সূত্র আছে যা ভারতকে অন্য দেশ থেকে পৃথক পরিচয় প্রদান করে। এই পরিচয়কে বজায় রাখবার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত প্রাক্তন অধ্যাপক

তোলাবাজি উন্নয়নের কোন ধারায় পড়ে ভাবা দরকার

অনামিক রায়

মূল প্রশ্নটি হলো, গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কী পেল? একটা একটা করে ধরা যাক আসলে কী ঘটেছে। প্রথমে প্রাণীসম্পদ বিভাগ। এই দপ্তরের সরকারি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড হলো মুরগির ছানা বিতরণ, ছাগল বিতরণ, গরিব মানুষদের হাঁসের বাচ্চা বিলি করা, বাছুর বিলি করা। সবই প্রান্তিক মানুষের জন্য।

গত ১০ বছরের যত মুরগির বাচ্চা বিলি করা হয়েছে, এই কর্মকাণ্ড যদি সঠিকভাবে করা হতো তাহলে সত্যিই কিন্তু প্রান্তিক মানুষগুলোর হাতে কিছু পয়সা আসত বা প্রোটিনের সংস্থান হতো। কিন্তু আসলে কী হয়েছে! কিছু কিছু ইউনিট আছে যারা এই মুরগির বাচ্চাগুলো তৈরি করে সাপ্লাই দেয়। এর মধ্যে সরকারি কিছু ফার্ম আছে আর আছে কিছু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তৈরি করা ফার্ম। যেগুলি সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত সেগুলো থেকে এই মুরগির বাচ্চাগুলো সাপ্লাই করা হয়। জেলার আধিকারিকরা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর এবং পঞ্চায়েত সমিতির স্তর থেকে আসা কোটা প্রাপ্ত সংখ্যা দিয়ে ওই এলাকার ফার্মকে বা অন্য ফার্মকে অর্ডার দেন। শর্ত থাকে ২৮ দিনের সুস্থ সবল বাচ্চা সাপ্লাই করতে হবে। এই অর্ডার পাওয়ার জন্য ফার্মগুলো কিছু নেতাদের ধরে। প্রতিটা বাচ্চা পিছু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ না দিলে ওই ফার্মগুলো কিন্তু আর অর্ডার পাবে না। প্রতিটা বাচ্চা পিছু নির্দিষ্ট করা অর্থ দিলেই ওই অর্ডার পাওয়া যায়। ২৮ দিনের বাচ্চা পিছু লাভ হয় ৭ থেকে ৯ টাকা তার থেকে যদি একটা অংশ চলে যায় তাহলে ফার্মের মালিকের কতই-বা থাকে। সেজন্য যেটা করা হয় সেটা ২৮ দিনের বদলে ১৫-১৮ দিনের বাচ্চা সাপ্লাই করা হয়। ফল হয় যথারীতি। ওই মুরগির বাচ্চাগুলো নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ মারা যায় আর ঢক্কানিনাদ করে প্রচার হয় এত মুরগির বাচ্চা বিলি করেছি। প্রান্তিক মানুষগুলো যেখানে থাকার সেখানেই থাকে। ছাগলের বাচ্চা বিলি করার ক্ষেত্রে আবার আরেক পদ্ধতি। সংখ্যাগুলো নির্দিষ্ট হয়ে যাবার পর বলা হবে থাকে যে স্বনির্ভর দলের গোষ্ঠীদের কাছ থেকে এটা নিতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক করে কারা পাবে। অর্থাৎ একটা পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী কারা ছাগল সাপ্লাই দেবে পার্শ্ববর্তী ব্লকে সেটা ঠিক করা হয়। সভাপতি, প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ সবাই মিলে ঠিক করবে বেনিফিশিয়ারি কারা হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর থেকে নেওয়ার গল্পটা আসলে এরকম : একটি সাপ্লাইয়ার ঠিক করা থাকে তাকে টোটাল সংখ্যার উপর একটি রেট করে প্রতিটা ছাগলের উপর যত টাকার কাটমানি থাকে সেইটা ওই নির্দিষ্ট লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। আর স্বনির্ভর গোষ্ঠী? ওদের মেয়েদের একাউন্টের মাধ্যমেই কিন্তু পুরো ট্রানজেকশন হয়। গরিব মানুষগুলো যারা ছাগলবাচ্চা পায় তারা বিনা পয়সায় যা পাওয়া যায় তাই ভালো এই ভেবে নিয়ে যায়। কে প্রতিবাদ করবে? প্রতিবাদ করলেই প্রথম যেটা বলা হয় সেটা হলো বিনা পয়সার জিনিস তার আবার ওজন কী? পরিণতিতে কিছু সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, কিছু পরে মারা যায়। আর যে কটা বাঁচে তাদের স্থান হয় কষাইখানায়। হাঁস বাচ্চা বিতরণের একই চিত্র। সুতরাং যেটা হয় সেটাই মানুষগুলো মেনে নেয় কারণ প্রতিবাদ করার স্পর্ধা কারোর নেই। যদি প্রতিবাদ করে বেনিফিসারি তালিকা থেকে বাদ যাবে। আরও অনেক কিছু হতে পারে তাই হককের ধন নয়, বিনা পয়সায় যা পাওয়া যায় তাতেই সুখ। এই জিনিসের যা পরিণতি হবার তাই হয়। প্রাণীসম্পদ বিভাগের এই পরিকল্পনা দশটা বছর এই ভাবেই চলেছে এবং এই ভাবেই উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকছে। কথা হলো এগুলোকে কি সত্যিই Sustainable Development বলা যাবে অথবা আদৌ কি এগুলোকে উন্নয়ন বলব? এবার আরেকটা বিষয়ে আসা যাক। সেটা হলো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক বিতরণ। আপনারা সবাই জানেন যে দুটো সেট করে ছেলেদের এবং মেয়েদের পোশাক বিতরণ করা হয়। গত বছরের আগের বছর পর্যন্ত ৪০০ টাকায় দুটি সেট দেওয়া হতো। এবার এটা বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। এবার আমি আপনাদের একটা ছোট্ট হিসাব দিই। সেটা হলো কোনো একটা জেলাতে যদি পাঁচ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী থাকে তাহলে এই পাঁচ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ৬০০ টাকা করে ধরলে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০ কোটি টাকা। তাহলে একটা জেলায় প্রায় ৩০ কোটি টাকার পোশাকের বাজার থাকে। যদি টুয়েন্টি

অনায়াস লব্ধ অর্থের প্রাচুর্য, আরও অর্থের কামনায় চতুর্দিকে মাসলম্যান তৈরি করছে। অদ্ভুত ভাবে এই ভাবনার সঙ্গে প্রশাসনের একাংশের যোগাযোগ ও মদত মিলছে। অনেকটা মিথোজীবীতার মতো। দুজনেই দুজনকে সাহায্য করে।

পার্সেন্ট করে প্রফিট থাকে তাহলে প্রফিটের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬ কোটি টাকা। সুতরাং এখানেও একই পদ্ধতি, স্বনির্ভর দলের সদস্যরা পোশাক বানাবে। তাদের ক্লাস্টারগুলো বিভিন্ন মেশিন কিনবে। তাদের সদস্যদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে বিভিন্ন জায়গায় স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রামের আন্ডারে। বিভিন্ন স্বনির্ভর দলের মেম্বারদের ট্রেনিং দেওয়া হয় যাতে করে তারা মেশিন কিনে সাপ্লাই দিতে পারে। এই মোটামুটি পরিকল্পনা।

আসলে কতকগুলো নির্দিষ্ট করা লোক এই পোশাক সাপ্লাইয়ের অর্ডারটা ঠিক করে। তার মধ্যে নির্দিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান আছেন বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আছেন বা এলাকায় যদি শক্তিশালী নেতা থাকেন তাহলে তিনি ঠিক করে দেবেন কে পোশাক সরবরাহ করবে। বাকিটা তিনি দেখে নেবেন। এখানেও জানি না ২৫ শতাংশের গল্প আছে না ৭৫ শতাংশের গল্প আছে। তবে কিছু যে আছে এটা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এভাবে দিনের পর দিন চলছে, বছরের পর বছর চলছে। স্বনির্ভর দলের পোশাক সাপ্লাইয়ের ট্রেনিং চলছে, স্বনির্ভর দল গঠন হচ্ছে। ওরা প্রতি পোশাক পিছু ৫-১০ টাকায় ওদের অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিচ্ছে। বেচারারা আর কী করবে? প্রতিবাদ করলেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আর হবে না। গ্রুপ থেকে বাদ যাবে। গ্রুপের মেয়েদের ধড়ে মাথা আছে যে এই কথা অমান্য করে অন্য কিছু করার? এই হলো পশ্চিমবঙ্গে women empowerment- এর গল্প।

এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত নার্সিংহোম এবং স্বাস্থ্য ভবনও।

স্বাস্থ্যসাথীর আন্ডারে যুক্ত নার্সিংহোম গুলোর অনুমোদন হয় রাজ্য সরকারের Clinical Establishment Act অনুযায়ী। কেউ কি দেখে এদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও অন্যান্য পরিষেবা যে ভাবে হওয়ার কথা সেভাবে চলছে কিনা? দেখার লোক আছে কিন্তু ওটা অন্যভাবে ম্যানেজ হয়ে যায়। ফলে যেটা হয় এদের বিভিন্ন চিকিৎসা বিল বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা আছে। এই কাজে যুক্ত আছে স্বাস্থ্য ভবনের একটি চক্র। ধরা যাক কোনো একটি চিকিৎসায় যদি ১৫ হাজার টাকা খরচ হয় তবে এই টাকা প্রায় ৩ থেকে ৪ গুণ পর্যন্ত বিলের অঙ্ক ধার্য করা হয়ে থাকে। এটি অনুমোদনের জন্য যাবতীয় তৈরি করা কাগজপত্র-সহ স্বাস্থ্যভবনে পাঠানোর পর নির্দিষ্ট একটি চক্রের তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত হয় এবং এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক ও অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিজেদের মাইনে ছাড়াও প্রতি মাসে অতিরিক্ত বেশ কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ লাভ হয়ে থাকে।

নার্সিংহোমের কোনো কাজের গাফিলতি হলে তা একটি নির্দিষ্ট ফোরামে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি আছে। তারা এই ধরনের গাফিলতির তদন্ত করে এবং তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবে যেটা হয় তা হলো এই ধরনের কাজে যিনি অভিযোগ করেন তিনি স্থানীয় কোনো নেতার মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে এসে এই নার্সিংহোমে হুজ্জুতি শুরু করেন। এরপর অনেকটা গটআপ কেসের মতো পুলিশ যথারীতি আসে। সেখানে মীমাংসা হয় এটাই যে আর একটি মিটিং করা হবে। এই মিটিংয়ে বাড়ির লোকজন মানে ওই নেতা ও তার দলবল, ডাক্তার, এনেসথেসিস্ট, নার্সিং স্টাফ, অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং নার্সিংহোমের মালিক উপস্থিত থাকবেন। যথারীতি এই মিটিং হয় এবং একটি অর্থ ঠিক করা হয়। নার্সিংহোমের মালিক যাকে নার্সিংহোম চালাতে হবে তিনি বিনা বাক্যে ওই অর্থ দিয়ে দেন। সার্জেন ওই অর্থ দিয়ে দেন এবং বাকি যারা থাকেন তাদেরকে মুখে মুখে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তারাও বিনা বাক্য ব্যয়ে অর্থ দিয়ে দেন। যদি কেউ না দেন বা মিটিংয়ে না আসেন তবে ওই পুলিশ অফিসার তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আসতে বাধ্য করেন।

কোথায় ফোরাম? কোথায় কি? এই ভাবেই তোলাবাজি চলছে। নার্সিংহোমগুলো বেআইনিভাবে রোজগার করছে। ব্যবসা করছে ও তাদের অর্থ আর একজন তোলাবাজির করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে পুলিশ প্রশাসন যুক্ত হয়ে পড়েছে। তবে এ ধরনের সংগৃহীত অর্থে ভাগ ৭৫ পার্সেন্ট ও ২৫ পার্সেন্টের মধ্যে পড়ে কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। তবে কিছু একটার মধ্যে যে পড়ে এটা কিন্তু নিশ্চিত আছে।

গত দশ বছরে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে এই ধরনের কাজের প্রবণতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক তা দপ্তরের হোক বা প্রভাবশালী হোক তার প্রভাব খাটিয়েছেন। সমাজের সর্বস্তরে এই বিনা পরিশ্রমে অর্থ রোজগার করার প্রবণতা কয়েক হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এগুলো প্রকৃত উন্নয়নের সংজ্ঞা কিনা। মানুষ চুরি করুক, ডাকাতি করুক, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করুক, ঘুষ খাক তবু এইগুলোকে উন্নয়ন বলা যাবে কিনা সেই প্রশ্নটাই আজ ঘুরে ফিরে আসছে। যে গভীর খাদে পশ্চিমবঙ্গবাসী পড়েছে তার থেকে কি আদৌ উদ্ধার হবে? সদর্থক রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি কি কোনো দিন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তৈরি হবে?

কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। অনায়াস লব্ধ অর্থের প্রাচুর্য, আরও অর্থের কামনায় চতুর্দিকে মাসলম্যান তৈরি করছে। অদ্ভুত ভাবে এই ভাবনার সঙ্গে প্রশাসনের একাংশের যোগাযোগ ও মদত মিলছে। অনেকটা মিথোজীবিতার মতো। দুজনেই দুজনকে সাহায্য করে। একটা সমাজের রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রের প্রায় পুরোটাই অদ্ভুত ভাবে হয় কাটমানিখোর না হলে দালাল চক্রের অংশীদারিত্ব করে বেড়াচ্ছে। এদের উদ্ধত রথচক্রের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে প্রশাসনিক এক অংশ। কখনও এ ওকে চালাচ্ছে কখনও বা একে ও চালাচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, এভাবেই কি চলবে? অন্য দল যদি সরকার পরিচালনায় আসে তবে কি সদর্থক ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও কাজের লোকগুলোকে সার্পোট দেবে? এটা থেকে বেরোতে হবে নাহলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ আরও এক গভীর অন্ধকার দিকে চলতেই থাকবে। আজ যে উন্নয়ন রাস্তায় লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাল আমাদের আপনাদের বাড়িতে প্রবেশ করবে। ▯

বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার হবার খবরে কেঁদেছিলেন সুভাষ

শুক্লা সিকদার

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তী এক ২৩ জানুয়ারি। সেদিন সকলের প্রিয় নেতাজী সুভাষের জন্মদিন। পার্থক্য শুধু এই, সেদিন দেশ স্বাধীন অথচ ভারতবর্ষের বলিষ্ঠ দেশনায়ক তার অত্যন্ত কাছের সুভাষকে আর দেখতে পাওয়ার সুযোগ নেই। তাই আদরের সুভাষের কথাই সকাল থেকে বারবার মনে পড়ছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-জায়া বাসন্তীদেবীর। তিনি আপনমনে ভাবছেন সুভাষের অন্তর্ধানের আগের দিনগুলোর কথা। অন্তর থেকে তিনি অনুভব করছেন সন্তানতুল্য আদরের সুভাষকে দেখতে না পাওয়ার বেদনা। মনে মনে তিনি যেন আওড়াচ্ছেন—সুভাষ সেই যে গেল, আর এল না। সে যে নেই একথা ভাবা সুভাষের মাতৃতুল্য বাসন্তীদেবীর পক্ষে তখনও বস্তুত অসম্ভব। তবে সুভাষ যে রয়েছেন সেকথা বলারও তো অবকাশ নেই। আর শুধু তাকেই-বা দোষ দেওয়া কেন? যখন সুভাষের অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করতে গোটা দেশ দিশেহারা, গোটা বিশ্ব তোলপাড়, তখন কই সুভাষ তো একবার সশরীরে সামনে এসে দাঁড়ালো না স্বাধীন ভারতে, তাও কি সম্ভব? কী হয়েছিল সুভাষের? কেন হয়েছিল? এই কথা ভেবে ভেবেই যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে তাঁর প্রাণ।

নিজেকে সামলে নিয়ে বাসন্তীদেবীর মন আবার চলতে থাকে স্মৃতির সরণি বেয়ে। কেমন খ্যাপাটে ছিল সুভাষ তা বাসন্তী দেবীর মতো করে আর কজনই-বা জানে। মনে পড়ে

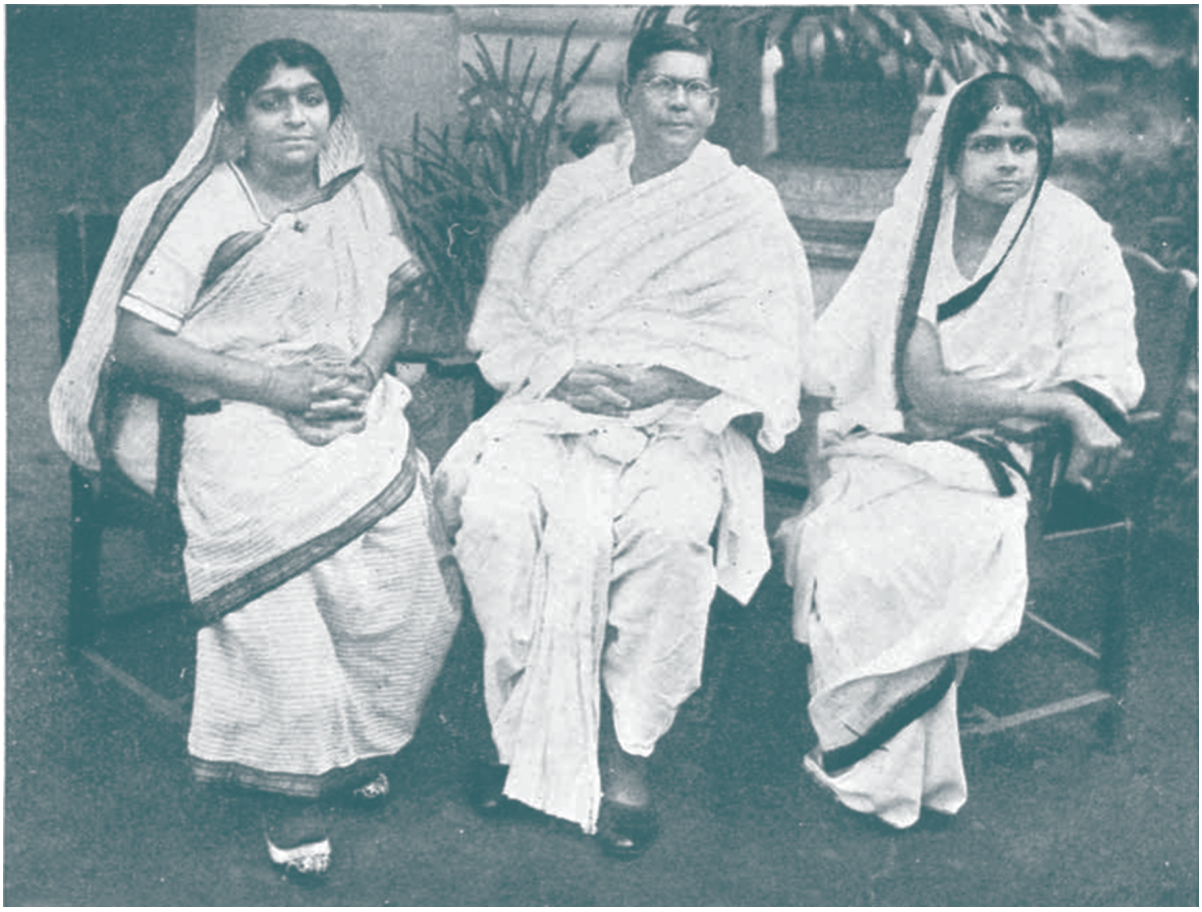

SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063, Tel. : 011-25251588, 25253681
Email : suryainterview@gmail.com Website : www.suryafoundation.org

सूर्या फाउण्डेशन युवाओं के समग्र विकास तथा प्रशिक्षण के लिए अब एक जानी-मानी संस्था बन चुकी है। इसका प्रमुख उद्देश्य है देश के प्रति निष्ठा रखते हुए अनेक तरह के उत्तरदायित्व निभाने के लिए तेजस्वी, लगनशील तथा धुन के पक्के नवयुवकों का निर्माण करना।

इन्टरव्यू में चयन हो जाने के बाद सूर्या साधना स्थली कैंपस में छः माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद एक साल के लिए On Job Training (OJT) रहेगी।

संघ के संस्कारों में पले-बढ़े, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, शारीरिक रूप से सक्षम युवकों के सूर्या फाउण्डेशन में प्रवेश हेतु निम्न categories में इंटरव्यू होगा–

Post	Experience	6 months Initial Training + 1 year OJT	After Training CTC
CA	IPCC / MTER (2 Yrs Experience)	3 - 4 L Per Annum	As per Performance
	Fresher	4 - 5 L Per Annum	- do -
	Experienced (upto 5 years)	6 - 8 L Per Annum	- do -
	Experienced (above 5 years)	9 - 12 L Per Annum	-do -
Engineers, Fresher & Experienced	B.Tech (IIT)	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	B.Tech (NIT)	4.5 - 5 L Per Annum	- do -
	B.Tech (Other Institutes)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	M.Tech (IIT)	8.5 - 10 L Per Annum	- do -
	M.Tech (NIT)	5.5 - 7 L Per Annum	- do -
	M.Tech (Other Institutes)	3 - 3.6 L Per Annum	- do -
MBA	MBA (IIT + IIM)	15 L + Per Annum	- do -
	MBA (IIM)	12 - 15 L Per Annum	- do -
	MBA (Other Institutes)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
Post Graduate & Graduate	MCA, B.Ed., M.Ed., MSW, M.Sc., M.Com., M.A. *(Freshers / Experience) Ph.D. **	2 - 3 L Per Annum	- do -
	Mass Communication (Media)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store	2.4 L Per Annum	- do -
	B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com (Persuing / Passed)	1.2 L Per Annum	- do -
	Diploma	1.8 L Per Annum	- do -
Law	LLB	2 L - 3 L Per Annum	- do -
	LLM	3 L - 3.6 L Per Annum	- do -

- उपरोक्त Categories में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को इससे भी अधिक वेतन दे सकते हैं।

* **Ph.D. candidates भी आवेदन कर सकते हैं। salary interview के दौरान तय होगी।**

2. **Graduate Management Trainee (GMT)**

योग्यता–2020 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 60% तथा गणित में 75% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। OJT / PCT के साथ-साथ ग्रेजुएशन और MBA या MCA करने की सुविधा दी जायेगी। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी, साथ ही 3000/- प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगा। On Job Training के दौरान आवास तथा पढ़ाई के साथ-साथ 11वीं में 6000/-, 12वीं में 7000/- Graduation Ist year में 9000/-, IInd Year में 10500/-, IIIrd Year में 12000/-, MBA/MCA Ist Year में 15000/-, MBA/MCA IInd Year में 20000/- Stipend प्रतिमाह मिलेगा। MBA/MCA पूरा होने के बाद 30000/- और Work Performance के आधार पर प्रतिमाह वेतन इससे अधिक भी हो सकता है।

3. **Assistant Staff Cadre (ASC)**

योग्यता– 2020 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 55% एवं गणित में 60% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद OJT / PCT में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 3000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा तथा मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था होगी। तीन वर्ष की OJT / PCT के दौरान Stipend - Ist year : 7,000/- प्रतिमाह व आवास, IInd year : 8,500/- प्रतिमाह व आवास, IIIrd year : 10,000/- प्रतिमाह व आवास। After training 13,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

4. **Under Graduate Management Trainee (UGMT)**

योग्यता–2020 में 12वीं कर चुके भैया आवेदन कर सकते हैं। 12वीं में न्यूनतम अंक 70% प्राप्त किए हों और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आयु : 19 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी। OJT / PCT के साथ-साथ Graduation के बाद MBA/PG in Mass Communication करने की सुविधा दी जायेगी। इस दौरान आवास तथा पढ़ाई के अलावा Graduation IInd year में 12,000/-, IIInd Year में 14,000/- तथा Post Graduation Ist Year में 17,000/- तथा IInd Year में 20,000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा। Post Graduation पूरा करने के बाद 30,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजें। विस्तृत बॉयोडाटा के साथ-साथ यदि आपने NCC / NSS / OTC / ITC / शीत शिविर / PDC आदि कोई शिविर किया है तो उल्लेख करें। सेवा भारती / विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ या परिषद अथवा विविध क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे। सूर्या परिवार में कोई परिचित हों तो उनका नाम, विभाग भी जरूर लिखें। पढ़ाई का विवरण लिखते हुए, Mark sheet की फोटोकॉपी साथ जोड़ें।

कृपया विस्तारपूर्वक बायोडाटा के साथ निम्नलिखित पते पर अपना CV / आवेदन भेजें। CV / आवेदन Email से भी भेज सकते हैं।

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063 | Email : suryainterview@gmail.com

आवेदन विज्ञापन छपने के एक माह के भीतर करें

তার ওপর সুভাষের যত জেদ, যত আবদার, যত অভিমান। বলা নেই, কওয়া নেই, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরত সুভাষ। এমনই ভ্রাম্যমান নিশাচর সুভাষ একদিন রাত ১১ টার পরে দুম করে এসে হাজির বাসন্তীদেবীর কাছে। এসেই আবদার—শীগগির খেতে দিতে হবে, ভীষণ খিদে পেয়েছে। বাসন্তীদেবীদের খাওয়াদাওয়া কখন শেষ—কাজের লোকেরা রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার পাট সব চুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গেছেন। সুভাষ কি আর সেকথায় কর্ণপাত করেন। আবদারই করে বসলেন—''কেন, ভাতে ভাত খাব''। তবুও তিনি সুভাষকে বোঝান, ওরে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, ওদিকে যে তোমার মা না খেয়ে খাবার নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু সব অনুরোধ বৃথা। শেষ পর্যন্ত ওই রাত্রে যাহোক কিছু রেঁধে দিলেন। এ ছাড়া বাসন্তীদেবীর মুক্তি পাবার কোন উপায় ছিল না। তাই বুঝি সুভাষের মা প্রভাবতীদেবী বাসন্তীদেবীকে প্রায়ই বলতেন—ওর আমি জন্মই দিয়েছি—কিন্তু সুভাষের মা তো আপনিই।

তবে বাসন্তী দেবীর আজ আরও বেশি করে মনে পড়ছে যে এমনিতে সংকল্পে কঠোর হলেও মনের ভেতরে সুভাষের যে কী আশ্চর্য কোমলতা ছিল তা হয়তো অনেকেই জানত না। আর সুভাষ যখনই যেখানে যেত, তার পেছনে গোয়েন্দা লেগেই থাকত। একদিন রাত্রে সুভাষ বাসন্তীদেবীর বাড়ি এসেছেন—এসেই যেমন অভ্যেস, খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়া—কিছুটা বিশ্রাম, সেই অবকাশে বোধহয় নতুন কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। সেদিন বাসন্তীদেবী লক্ষ্য করলেন তাদের বাড়ির বিপরীত দিকের ফুটপাথে একজন পায়চারি করছেন অবিরত। বাইরে তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু বৃষ্টি উপেক্ষা করেও ওই ব্যক্তির চোখ সুভাষকে অনুসরণ করে যাচ্ছে। সাবধানতাবশত তাই তিনি সুভাষকে কিছুতেই বাড়ি পাঠাতে পারছেন না। বাসন্তীদেবী কিছুটা কৌতুকের ছলেই বলে উঠলেন—''হ্যাঁ সুভাষ, তুমি তো দিব্যি এখানে পড়ে রইলে, আর ওই বেচারা যে তোমার জন্য বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছে, নড়তেও পারছে না। বলি, ওর কী দোষ বলতো। বেচারার চাকরি বাঁচাতে এতো কৃচ্ছসাধন। কিন্তু ওর তো বাড়িতে স্ত্রী কিংবা মা আছে, মেয়ে কিংবা ভাই-বোন আছে। ভেবে দেখো তো, এই বৃষ্টির মধ্যে ওর জন্য তাদেরও কত ভাবনা হচ্ছে'।

বাসন্তীদেবী এটুকু বলেই দেখলেন, সুভাষের সেই আগুন ঝরানো চোখ অশ্রুসজল, কোনোমতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে দেশনায়ক। বাসন্তীদেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হয়তো-বা একটু লজ্জিতও হল সে। বাসন্তীদেবী সেদিন সুভাষের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন—অন্যের কষ্ট যে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না সুভাষ এমনকী, কারও কোনো বিপদের কথা শোনামাত্র সুভাষের মন ব্যথায় বিহ্বল হয়ে পড়ত। আর তার বিরুদ্ধেই কিনা তার নিজের দেশের মানুষদেরই গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করতো ব্রিটিশরা। আজ সুভাষের সেই আজন্মলালিত ভারতবর্ষ স্বাধীন কিন্তু এ স্বাধীনতা সুভাষহীন।

তখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলছে। বাসন্তীদেবীরা ঠিক করলেন তারাও ঝাঁপিয়ে পড়বেন আন্দোলনে। বাসন্তীদেবী জানতেন সুভাষ কিছুতেই রাজি হবেন না তাদের আন্দোলনে যেতে দিতে। অথচ সুভাষ তখন 'বিপিসিসি'র প্রেসিডেন্ট। তাঁর অনুমতি না নিয়ে বাসন্তীদেবীদের যাওয়াও চলে না।

সুভাষের বক্তব্য, ''আগে আমরা যাই, তারপর তো মেয়েরা, মায়েরা। এখনও আপনাদের যাওয়ার সময় হয়নি'। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন বাসন্তীদেবীরা। কিন্তু সেকি আর বোঝে। মাতৃতুল্য বাসন্তীদেবীদের প্রতি সাবধানতাবশতই সুভাষের সেই বারণ তা বুঝতে কারও বাকি রইলো না। আন্দোলনে যেতে মরিয়া বাসন্তীদেবীরা সুভাষকে অনেক করে বুঝিয়ে শেষে সম্মতি পেলেন। ৬ মে বাসন্তীদেবীরা আনেদোলনে যোগ দিলেন। বাসন্তীদেবী সমেত তার ননদ উর্মিলাদেবী আর সুনীতি মিত্র গ্রেফতার হলেন। বাসন্তীদেবীদের সকলকে নিয়ে যাওয়া হল বটতলা থানায়।

এদিকে বাসন্তীদেবীদের গ্রেফতারের খবর পেয়ে বটতলা থানার চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য। প্রায় পাঁচহাজার লোক বটতলা থানা ঘেরাও করে ফেলেছে। দারুণ উত্তেজনা। সেই জনতাকে কোন মতেই আটকানো যাচ্ছে না। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ অফিসারকে বাসন্তীদেবী বললেন, তাদের বাড়ির গাড়ি আনার ব্যবস্থা করে দিতে—বাড়ির গাড়িতে চেপেই তাহলে বাসন্তীদেবীরা জেলে যাবেন, নইলে ওদের গাড়িতে বাসন্তীদেবীদের নিয়ে যাওয়ার ধাক্কা ওঁরা সামলাতে পারবেন না।

বাসন্তীদেবীরা লালবাজারে এলে একজন উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার জানালেন, ওনারা যদি লিখিতভাবে শপথ করেন যে আন্দোলনে আর যোগ দেবেন না, তবেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে। বাসন্তীদেবীরা তখন অকপটে ওই পুলিশ অফিসারকে বলে উঠলেন, ''মজার কথা শোনালেন, আমরা শপথই যদি করব তবে গ্রেফতার হলাম কেন?

কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহাবিপদে। একদিকে স্বাধীনতাকামী ক্ষুব্ধ দেশবাসী—আর একদিকে ইংরেজদের আইন। শেষপর্যন্ত বাসন্তীদেবীদের জেলে পাঠানোই সাব্যস্ত হল। বাঙ্গালি নারীবাহিনী সেদিন নির্দ্বিধায় বরণ করে নিল জেলযাপন।

হঠাৎ ছন্দপতন। ওমা, জনগণের চাপের আশঙ্কায় রাত দুটোয় হাঁকাহাঁকি। কী ব্যাপার? মুক্তির আদেশ এসে গেছে। চলে যেতে হবে। জেলের অধ্যক্ষকে বাসন্তীদেবী বললেন, ''রাতটা কাটুক, কাল সকালেই না হয় যাবো।

কিন্তু না, গভর্নরের আদেশ অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। রাত দুটোয় অগত্যা বাড়ি। বাসন্তীদেবীদের ফিরতে দেখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও অবাক, সেইসঙ্গে মহাক্ষুব্ধও হলেন। ভাবগম্ভীরভাবে বললেন, 'ফিরে এলে'? রাত দুটোয় সুভাষও কোত্থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছে। মুখ তার তখনও কালো। সে মুখে কালবৈশাখীর গভীর তমসা।

বাসন্তীদেবী বুঝলেন, সুভাষ তখনও শান্ত হয়নি। হেসে বললেন—''কি এবার হয়েছে? ফিরে তো এলাম; আর কেন?''

কালবৈশাখীর মেঘ সরে গেল। শুরু হল বর্ষণ। সুভাষের সে কী কান্না। বাসন্তীদেবীর গ্রেফতারিতে সুভাষ কতটা মর্মাহত, আর কী ভালোই যে তিনি বাসতেন বাসন্তীদেবীকে তা প্রকাশ পেল সেদিন।

বাসন্তীদেবীর সেসব দিনগুলি আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। তার সন্তানতুল্য সুভাষের মতো সেই দিনগুলোও যেন সন্তর্পণে বিদায় নিয়েছে অজানার দেশে। বাসন্তীদেবীর কাছে আজ পড়ে রয়েছে শুধু স্বর্ণালি স্মৃতি, আর আদরের সুভাষের হৃদয় ব্যাকুল করা দেশপ্রেম।

শব্দরূপ-৫ (বিষয় অভিমুখ—রামায়ণ) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

১		২	■	৩	■	৪	৫
	■	৬	৭		৮	■	
৯	১০	■		■	১১	১২	
■	১৩			১৪	■	১৫	
১৬		■	১৭				■
১৮		১৯	■		■	২০	২১
	■	২২	২৩		২৪	■	
২৫		■		■	২৬		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সূর্যবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র ও সম্রাট।
৪. বানররাজ সুগ্রীবের পত্নী।
৬. নরপতি রামচন্দ্র।
৯. আবর্তমান বিষয়।
১১. তাড়কা...শূর্পনখা-এরা সবাই...।
১৩. দণ্ডকারণ্যের পর্বত/একজন রাক্ষস।
১৫. জননী।
১৬. ইন্দ্রজিতের যে অস্ত্রে (পাশ) রাম-লক্ষ্মণ কাবু হয়েছিলেন।
১৭. নরশ্রেষ্ঠ—রাজা।
১৮. মত্ততা।
২০. বানরদের সেনাপতি ও ইঞ্জিনিয়ার।
২২. ধরিত্রী—সীতার প্রতীকী মা।
২৫. ভরতের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
২৬. নির্মাণ...বিন্যাস।

উপর-নীচ : ১. তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র। **৪.** বানরাজ বালীর পত্নী।
৩. বার্ধক্য...শরীরের অনিবার্য দশা। **৫.** লঙ্কা যুদ্ধে রামকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নির্মিত সীতার প্রতিমূর্তি।
৭. প্রথমে বালীর পরে সুগ্রীবের মন্ত্রী। **৮.** দস্যু রত্নাকরের জপমন্ত্র, উল্টো 'রাম'। **১০.** ধারাবাহিক...পরম্পরাগত। **১২.** ক্ষমা প্রার্থনা।
১৪. অধম মনুষ্য...দুরাত্মা। **১৬.** যাহাতে নাম লিখিত আছে।
১৯. নূতন।
২১. শত্রুঘ্ন যে দৈত্যকে বধ করেন।
২৩. অমৃত
২৪. বাণ...শর।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

সংগঠন শাস্ত্রে গর্ব, অহংকার বা ব্যক্তিগত স্বার্থের স্থান থাকিতেই পারে না। সংগঠন শব্দে ইহাই বুঝায় সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। নিজের ব্যক্তিত্বের টাট্টু ঘোড়া যেখানে-সেখানে আনিয়া হাজির করিলে সংগঠন হয় না। অবশ্য সংগঠনের জন্য আদর্শ ব্যক্তিত্ব নির্ধারণকারী গুণসমূহের প্রয়োজন হয়। একথা ঠিক যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন গুণের জন্য আপনি বিভিন্ন ভাবে সম্মানিত হইবেন এবং কীর্তিলাভ করিবেন। কিন্তু সেই গুণ সার্থক হইবে তখনই যখন আপনি আপনার সব কিছু সংগঠন কার্যে প্রয়োগ করিবেন।

* * *

তোমার জীবন এরূপ ভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে সঙ্ঘ সেখানে প্রধান স্থান অধিকার করে। তোমার যেন এইরূপ বলিবার প্রয়োজন প্রয়োজন না আসে যে পরিস্থিতি বিরূপ বলিয়া যেটুকু কাজ আমার পক্ষে সম্ভব আমি তাহাই করি। আমি এই কথা বলি না যে তুমি বাড়ির কাজ অথবা চাকরি ইত্যাদি করিও না। কিন্তু একথা অবশ্য বলিব যে চাকরি এমন কর যাহাতে তুমি সঙ্ঘের কাজ ঠিকভাবে করিতে পার। তোমাকে ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে যে, চাকরি যাহারা করে না তাহাদের চেয়ে তুমি বেশি কাজ করিতে পার। 'যাহারা সংসারের ঝামেলায় পড়ে নাই তাহাদের চেয়ে বেশি কাজ আমি করিতে পারি' এরূপ বলিবার মতো আদর্শনিষ্ঠ আচরণ তোমার থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ তোমার আচরণ সব সময়ে এরূপ হওয়া দরকার যাহাতে তুমি নিজে এবং অন্যান্য লোকেরাও একথা বলিতে পারে যে তোমার সংসার, তোমার চাকরি, এককথায় তোমার সব কিছু সঙ্ঘেরই জন্য।

* * *

যাহাদের আচার-ব্যবহার এক, পরম্পরা এক, সংস্কৃতি এক এবং ধ্যেয় এক— সেই সমস্ত লোকেদের মধ্যেই একতা হইতে পারে। আমাদের যতই মতভেদ থাকুক না কেন আসলে আমরা সমস্ত হিন্দুই এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের সকলের একই পবিত্র ভাষা। আমাদের রাজনীতি—সমাজ-রচনা ও তত্ত্বজ্ঞান এক। এইভাবে দেখা যায় যে আমাদের রাষ্ট্র সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান।

* * *

অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীর উপর আক্রমণ করা পৃথিবীর সব প্রাণীরই ধর্ম। 'মানুষ সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহার এই পশুবৃত্তি ছাড়িয়া দেখা উচিত'—এই কথা নীতি হিসাবে শুনিতে বেশ ভালো লাগে কিন্তু ইহাকে কাজে পরিণত করার এখনও অনেক দেরি আছে। ততদিন দুর্বল প্রাণীর উপর বলবান প্রাণীর আক্রমণ স্বাভাবিক ভাবেই হইতে থাকিবে। ইহার জন্য প্রকৃত দায়ী সেই সমাজ যে নিজে দুর্বল থাকিয়া অপেক্ষাকৃত বলবান সমাজকে তাহার উপর আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তোলে। প্রায়ই দেখা যায় যে এইরূপ আক্রমণের পিছনে দুর্বল সমাজের দুর্বলতাই দায়ী। পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিবার পাপ এই দুর্বল সমাজই করিতেছে বলা যায়। এই জন্য আক্রমণকারীকে বৃথা দোষ না দিয়া এবং প্রকৃতির উপরোক্ত নিয়ম ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত অশান্তির মূল কারণ যে দুর্বলতা তাহা প্রাণপণ চেষ্টায় দূর করাই দুর্বল সমাজের কর্তব্য।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)